দাম : দশ টাকা

ইসলামিক ফতোয়াবাজরা
গণতন্ত্রের সামনে
বড় বিপদ

পৃঃ - ১১

স্বস্তিকা

যে টাকা উদ্ধার হলো
তা উন্নয়নে সদ্ব্যবহার
করা কার দায়িত্ব ?

পৃঃ - ২৭

৬৯ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ৩০ জানুয়ারি ২০১৭।। ১৬ মাঘ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com ।।

সাধারণতন্ত্র দিবসের ৬৮তম বর্ষে সাধারণ মানুষ কতটা সুরক্ষিত

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ১৬ মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৩০ জানুয়ারি - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

।। সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।।

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৭

খোলা চিঠি : দিদিই এখন বুদ্ধদেব... □ সুন্দর মৌলিক □ ৯

রাজ্যজুড়ে তৃণমূল বনাম তৃণমূলের লড়াই চলছে
□ গূঢ়পুরুষ □ ১০

ইসলামিক ফতোয়াবাজরা গণতন্ত্রের সামনে বড় বিপদ
□ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১১

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের পটভূমি
□ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস □ ১৪

ভারতীয় গণতন্ত্র কি সঙ্কটের মুখে ? □ কে এন মণ্ডল □ ১৬

রাজনীতি শয়তানদের শেষ আশ্রয় □ অরুণ ঘোড়ই □ ২০

মহাভারতের অপ্রধান চরিত্র কৃতবর্মা
□ দেবপ্রসাদ মজুমদার □ ২১

চারণকবি বসন্ত গোবিন্দ পোৎদার
□ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ২৩

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত □ ২৪

যে টাকা উদ্ধার হলো তা অর্থনীতির উন্নয়নে সদ্ব্যবহার করা কার দায়িত্ব ? □ উমা শশীকান্ত □ ২৭

অর্থনীতির দিক থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম
□ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ২৯

তালিবানীকরণের দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ □ ৩২

অহেতুক কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে গিয়ে আখেরে রাজ্যের উন্নতি ব্যাহত করছেন মমতা □ জয়দীপ রায় □ ৩৭

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৪৩,৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **অঙ্গনা : ২৫** □

অন্যরকম : ৩৫ □ **সমাবেশ-সমাচার : ৪৪**

□ **রঙ্গম : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪১** □ **চিত্রকথা : ৪০** □

প্রাসঙ্গিকী : ৪৭

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রে মুক্তাঞ্চলের বিপদ

সারা দেশ যখন আটষট্টিতম প্রজাতন্ত্র দিবস পালনে মাতিয়াছে, তখন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তসীমায় একটি ক্ষুদ্র স্থান ভাঙড় মুক্তাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। মুক্তাঞ্চল অর্থাৎ সেখানে আইনের শাসন নাই। গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র হইতে সে সাময়িক চ্যুত হইয়াছে। রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর গোষ্ঠীকোন্দলের মাপকাঠিতে বিষয়টি কোনোমতেই বিচার্য নহে। বস্তুত, বিগত এক বৎসরে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ মুক্তাঞ্চলের দৃষ্টান্ত নেহাত কম দেখে নাই। আজও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্বোচ্চ সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে একশ্রেণির মানুষ মুক্তাঞ্চল হিসাবে দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামোর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা লইয়া সেই গণতন্ত্রকেই ভূলুণ্ঠিত করিবার প্রয়াস বিগত এক বৎসরে ক্রমশই পাকা হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের প্রয়োগ ও মাপকাঠি সর্বত্রই সমান। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর বহির্ভূত সুযোগ তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। এই বোধটুকু সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বিগত এক বৎসর যাবৎ আমরা ক্রমাগত এই ঘটনা দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়াছি যে, জে এন ইউ কিংবা যাদবপুরে পুলিশ কেন ঢুকিবে, অবান্তর এই প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। শিক্ষা-প্রাঙ্গণে পুলিশি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা লইয়া সংশয় আমাদেরও রহিয়াছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদিগের সুকুমার মনোবৃত্তির সুযোগ লইয়া যদি কেহ তাহাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করিয়া তাহাদের দেশবিরোধী কর্মে প্ররোচিত করে কিংবা উস্কাইয়া দেয় তবুও দেশের নিরাপত্তা-বাহিনীকে ধৃতরাষ্ট্র সাজিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে এমন মাথার দিব্যি কেহ দেয় নাই। কারণ, ভারতবর্ষের সীমারেখার মধ্যেই জে এন ইউ কিংবা যাদবপুরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অবস্থিত, আপামর শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভারতবাসীর করের টাকায় সেগুলি পরিচালিত হয়; সুতরাং তাহাদের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বলিয়া ভাবিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

অথচ বিগত এক বৎসরে ভারতবর্ষে এরকম বিচ্ছিন্ন দ্বীপ অর্থাৎ মুক্তাঞ্চল গড়িয়া তুলিবার জন্য অতি-বাম ও তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদমাধ্যমগুলি সক্রিয় হইয়াছে। এবং এই সক্রিয়তার সুযোগ লইয়া দেশের দেউলিয়া রাজনৈতিক দলগুলি ঘোলা জলে মাছ ধরিতে নামিয়া পড়িয়াছে। দেশের নিরাপত্তার খাতিরে বামেদের অতীত অতীব ভয়ঙ্কর। আজাদি তো ঝুটা ছিলই, ইতিপূর্বে বিয়াল্লিশে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তাহাদের সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্বাধীনোত্তর পর্বে গণতান্ত্রিক পীঠস্থান সংসদ ভবনকে যাহারা 'বরাহের খোঁয়াড়' আখ্যা দিতে পারে, গণতন্ত্রের স্বাপেক্ষে তাহারা চিরদিনই ভয়ানক। এই বিপদ বিগত এক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষকে পুনরায় করালগ্রাসে আচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস লইতেছে। জে এন ইউ, যাদবপুর ছাড়িয়া তাহাদের লক্ষ্য এবার মাটির নিকটবর্তী হওয়া। সেইসূত্রেই ইহাদের গন্তব্য ভাঙড়।

জনগণের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া তাহাদের ক্ষেপাইয়া তুলিবার কাজটি সহজতর। কিন্তু নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার কর্মটি কখনোই সহজসাধ্য নয়। অতি বাম ও বাম আন্দোলন কেবল প্রথমটির দিকেই তাহাদের জন্মলগ্ন হইতেই দৃক্‌পাত করিয়াছে। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তাহাদের অপারগতা স্বেচ্ছাকৃত। কারণ, বুভুক্ষু মানুষকে অন্নের গ্রাস হইতে বঞ্চিত করাই যে তাহাদের রাজনৈতিক পুঁজি। আর এহেন পুঁজিবাদের কারণেই জে এন ইউ হইতে ভাঙড় অবধি একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই দায় এড়াইতে পারেন না। তাঁহার হঠকারী কর্মকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসবাদ ও নকশালি শক্তির আঁতুড়ঘরে পরিণত হইয়াছে এবং ভাঙড়ে তাহারই বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়িতেছে।

সুভাষিতম্

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।

তীর্থ ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ।। (চাণক্য শ্লোক)

সাধুদর্শন সর্বদাই পবিত্র কর্ম। কারণ এ সংসারে সাধুগণই তীর্থতুল্য। তীর্থসেবার ফল সময়ে লাভ করা যায়। কিন্তু সাধুসেবা সর্বদাই ফলপ্রদ হয়।

দিদিই এখন বুদ্ধদেব...

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

এবার চিঠি আপনাদের। কারণ, দিদির এক সাফল্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। সিপিএমের নকল করতে করতে এত দিনে দিদি সত্যিকারের বুদ্ধদেব হয়ে উঠলেন।

ভাঙড়ে বিদ্যুতের সাবস্টেশন তৈরিতে পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক প্রস্তুতির অভাব ছিল। পাশাপাশি, দলের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে জমি নিয়ে বিক্ষোভ চূড়ান্ত আকার নিয়েছে বলে মনে করছে তৃণমূল। স্থানীয়স্তরে বিক্ষোভের মাত্রাই বা কেন বোঝা গেল না— তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে শাসকদলের অন্দরে। যে জমি আন্দোলনের মাধ্যমে তৃণমূলের উত্থান, ভাঙড়ে সেই জমি-বিক্ষোভই তাদের 'বেকায়দায়' ফেলেছে।

সরকারের তরফে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিক্ষোভ এড়িয়ে সাবস্টেশন তৈরির চেষ্টা হবে না। তিনি বলেন, ''ভাঙড়ে সরকারি প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের বিষয় নেই। সরকার গায়ের জোরে কোনো উন্নয়ন করতে যাবে না। জমির চরিত্র বদল করা যাবে না।''

সিপিএম এবং কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলের নেতাদের ভাঙড়ে 'যাতায়াত' নিয়েও আলোচনা হয়েছে শাসকদলে। তবে বিরোধী থাকাকালীন তৃণমূল যে অভিযোগ করত, এখন সেই সুর তৎকালীন শাসক সিপিএমের কথায়। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, ''সরকার গায়ের জোরে জমি লুঠ করছে। প্রতিবাদ করলে পুলিশ নামিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় না। বহু ফসলি জমির উপর এত লোভ কেন!''

এইবার নিশ্চয়ই ভেঙে বলতে হবে না যে কীভাবে দিদি বুদ্ধদেব হলেন। ওপরের সংলাপগুলি আর একবার পড়ুন আর ফিরে যান সেই সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আমলে। দেখবেন ঠিক যেন সিপিএমের বলা কথাগুলিই বলছে তৃণমূল। আর সিপিএম হয়ে গিয়েছে তৃণমূল।

২০১৭ সালের ভাঙড়ের সঙ্গে ২০০৬-০৭-এর নন্দীগ্রাম- সিঙ্গুরের মিল কোথায়, অমিলই বা কোনখানে, সেই তর্ক আলাদা। শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই ভাঙড় অগ্নিগর্ভ হলো কি না, 'বহিরাগত' বলতে ঠিক কী বোঝায়, এই প্রশ্নগুলিও এখন গৌণ। ভাঙড়ের মূল কথা হলো, সিঙ্গুর আন্দোলনের দশ বছর পার হওয়ার পরও নতুন সরকারের দ্বিতীয় দফারও ছয় মাস পার হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া প্রকল্প বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। ভাঙড়ে কারখানা তৈরি হচ্ছিল না। কোনো বেসরকারি পুঁজিও খাটছে না। হাজার একর জমিরও গল্প নেই। ভাঙড়ে একটা বিদ্যুৎ সাবস্টেশন হচ্ছে। সরকারি প্রকল্প বাতিল হলে ৩০০ কোটি টাকা ক্ষতি হবে। যদিও প্রকল্পটি বাতিল হলে পশ্চিমবঙ্গের যে ক্ষতি হবে, তা ৩০০ কোটি টাকার অনেক অনেক বেশি।

রাজধর্ম পালনে ব্যর্থতার পরিণাম কী হতে পারে, সিঙ্গুরে দেখিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। ভাঙড় আরও একবার দেখাচ্ছে। পরিস্থিতি যে এতখানি মারাত্মক হতে পারে, পুলিশ-প্রশাসনের কাছে যদি তার খবরটুকুই না থাকে, তাহলে সেই ব্যর্থতা ব্যাখ্যাতীত। মনে রাখতে হবে যে-রাজ্যে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণক্ষম নয়, সেই রাজ্য বিনিয়োগের অনুপযুক্ত।

ভাঙড়ের অশান্তির মূলে কার্যত, সিন্ডিকেট— বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম পাপ। সিন্ডিকেটের বাড়বাড়ন্ত রাজধর্ম পালনে রাজ্যের ব্যর্থতার মোক্ষম প্রমাণ। কোনো একটি অঞ্চলে কোনো এক ব্যক্তি নিজের রাজনৈতিক প্রভাব ও বাহুবল ব্যবহার করে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবেন তা মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশকর্তারা বিলক্ষণ জানেন, কেন উর্দির দেখা পেলেই স্থানীয় মানুষ আরও রেগে যাচ্ছেন। আসলে, পুলিশ আর কাল্লু মোল্লা কিংবা আরাবলু মানুষের চোখে আলাদা নয়, এক।

কাল্লু মোল্লার দাপাদাপি, অসভ্যতা একদিনের ঘটনা নয়। পুলিশ সেই অন্যায় দমন করেনি, কাল্লু মোল্লাকে শায়েস্তা করেনি। মানুষ জানিয়েছেন, কাল্লু মোল্লারা পুলিশের প্রশ্রয়েই নিরাপদে থাকে, দাপিয়ে বেড়ায়।

কেন পুলিশ দুষ্কৃতীদের কাছে নতিস্বীকার করে, এই প্রশ্নের একটিই উত্তর— রাজনীতি।

মাশুল গুনতে হবে রাজ্য সরকারকে। পাপের ফল ভোগ করতে হবে রাজ্যবাসীকে।

—সুন্দর মৌলিক

রাজ্যজুড়ে তৃণমূল বনাম তৃণমূলের লড়াই চলছে

গূঢ় পুরুষের কলম

রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি একমত। সকালে খবরের কাগজ এবং সন্ধ্যায় টিভি চ্যানেল খুললেই দেখবেন মানুষ ক্ষুব্ধ, রুষ্ট। আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে অভিযুক্তদের গণপ্রহারে শাস্তি দিচ্ছে। কাউকে বলতে শুনছি না যে তাদের রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা আছে। পুলিশ, প্রশাসন, সরকার, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতি এমন অনাস্থা দেখেছিলাম ২০১০ সালে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনের চরম সময়ে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার তখন প্রশাসন চালাচ্ছে। জনরোষ ধিকিধিকি করে জ্বলতে শুরু করেছিল তার তিন বছর আগে থেকেই। কারণ, শিল্প গড়ার নামে জোর করে চাষিদের ফসলি জমি অধিগ্রহণের নোটিশ দিয়েছিল বুদ্ধবাবুর দাম্ভিক সরকার। শিল্পোন্নয়নের নামে বেসরকারি শিল্পপতিদের মুনাফা ঘরে তুলতে নামমাত্র মূল্যে চাষির জমি বামফ্রন্ট সরকার বিতরণের কর্মসূচি নিয়েছিল। এখন মমতার ছায়াসঙ্গী সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, হর্ষ নেওটিয়ারা তখন বুদ্ধ-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি। প্রতিদিন নিয়ম করে তাঁরা মহাকরণে বুদ্ধবাবুকে সেলাম বাজাতে আসতেন। এখন অসুস্থ বুদ্ধবাবুর খোঁজও নেন না। মমতার শিল্পোন্নয়নে তাঁরা প্রধান পরামর্শদাতা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের তাঁরা ছিলেন প্রধান দুই কারিগর। শিল্পপতিদের মূল লক্ষ্য মুনাফা করা। তাঁরা ক্ষমতাসীন দলের নেতা-মন্ত্রীদের ব্যবহার করে কাজ হাসিল করেন। বুদ্ধবাবু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা কেউই ব্যবসা বা শিল্পকারখানা গড়ার অ আ ক খ জানেন না। আমলাদের কথায় সিদ্ধান্ত নেন। আমলারা শিল্পপতিদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করে মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝান যে এরাই রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন করতে পারবেন। এদের উপর ভরসা রাখলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জোয়ার আসবে--- বুদ্ধবাবু এই টোপ গিলেছিলেন। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিলছেন।

সরকারের রঙ বদল হলেও চরিত্র বদল হয় না তার প্রমাণ ভাঙড়ের গ্রামবাসীদের গণবিক্ষোভ। নন্দীগ্রাম ও ভাঙড়ে চাষির জমি দখল করা নিয়ে সরকারি নোটিশকে কেন্দ্র করে গণক্ষোভ ধীরে ধীরে গণবিদ্রোহের চেহারা নেয়। ২০০৭-এর ৩ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে শৌচাগার নির্মাণের প্রচার করতে গেলে সরকারি গাড়ি পুড়িয়ে দেয় গ্রামবাসীরা। ভাঙড়ে ২০১৭-র ১৬ জানুয়ারি মধ্যরাত্রে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ এলাকায় অত্যাচার চালায়। পুলিশের গুলিতে ২ জন নিরপরাধ গ্রামবাসী প্রাণ হারান। ভাঙড়ে ১৩ একর জমিতে বিদ্যুৎ বন্টনকেন্দ্র গড়া নিয়ে তলে তলে একটা ক্ষোভ দানা বাঁধছিল কয়েক মাস ধরে। তবে তা মোটেই হিংসাত্মক ছিল না। কারণ, সরকার জমি অধিগ্রহণের পথে না হেঁটে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বাজারদরে চাষিদের কাছ থেকে কিনেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটিও প্রায় এক বছর আগেই নির্মাণ হয়েছে। শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়নি। যখন সরকার জমি কিনেছে এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণ হয়েছে তখন ভাঙড়ে আন্দোলন হয়নি। রহস্য যদি কিছু থাকে তা এখানেই। বিদ্যুৎ বন্টনকেন্দ্রের কাজই যখন সম্পূর্ণ তখন হাজার হাজার মানুষ হঠাৎ হৈ হৈ করে আন্দোলনে নেমে পড়লেন কেন?

অভিজ্ঞ গ্রামবাসীরা বলেছেন এলাকায় তৃণমূলের দুই স্থানীয় নেতা রেজ্জাক মোল্লা এবং আরাবুল ইসলামের ক্ষমতা দখলের লড়াইতে বিপর্যস্ত ভাঙড়। আরাবুলের গডফাদার তৃণমূল মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। রেজ্জাক মোল্লা এলাকার তৃণমূল বিধায়ক। কিন্তু দলের মধ্যে তাঁর প্রভাবশালী গডফাদার নেই। তিনি একাই একশো। শোভন চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূলের দায়িত্বে আছেন। আরাবুলের মাথায় তাঁর হাত থাকার সুবাদে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি গড়ার জন্য ১৩ কোটি টাকার বরাত পেয়েছিল আরাবুলের দলবলেরা। এখানেই গণ্ডগোলের গুরু। জমি দখলের জন্য আরাবুল আশ্রিত গুণ্ডারা মাস্তানি করা থেকে মেয়েদের শ্লীলতাহানি সব কিছুই অবাধে করতে থাকে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে যখন জমি বিক্রি বাবদ প্রাপ্য টাকার মোটা অংশ দলের চাঁদা বাবদ আরাবুল আত্মসাৎ করে। প্রতিবাদ করলে মারধর এমনকী বাড়িতে অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত করে তার পোষা গুণ্ডারা। আরাবুল-বিরোধী গণক্ষোভে ইন্ধন জোগায় রেজ্জাক-অনুগামী লাল্লু হোসেন। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই ভাঙড়ে অশান্তির আগুন জ্বলেছে। দলের ভেতরে টাকার বখরা নিয়ে যে লড়াই তার পরিণামে ২২৫ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারে। যেহেতু প্রকল্পটি কেন্দ্রের দেওয়া টাকায় হচ্ছে তাই তা বাতিল করতে মুখ্যমন্ত্রী এতটুকু দেরি করেননি। কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি বন্ধ করে মমতা দলের গুণ্ডামস্তানদের লড়াই চাপা দিলেন। মমতা বুঝেছেন যে নন্দীগ্রামের দেখানো পথেই ভাঙড়ের মানুষ আন্দোলন শুরু করেছেন। নন্দীগ্রামে বুদ্ধবাবু যাননি। গেলে ভাল করতেন। নিজে গিয়ে সভা করে নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব গড়া হবে না জানালে হয়তো সেখানে শান্তি ফিরতো। বুদ্ধবাবু মহাকরণে বসে কেমিক্যাল হাব বাতিলের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। নন্দীগ্রামের মানুষ সেই ঘোষণাকে বিশ্বাস করেননি। মমতা নবান্নে বসে বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাতিলের ঘোষণা করেছেন। ভাঙড়ের একজন মানুষও সেই ঘোষণাকে বিশ্বাস করেননি। মমতা ভাঙড়ের নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময় পেলেন না। অথচ দার্জিলিং যাওয়ার সময় পেলেন। ভাঙড়ের গণ-আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে মমতা এবং তাঁর দল কতটা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সারা রাজ্যজুড়ে তৃণমূল বনাম তৃণমূলের হিংসাত্মক লড়াই চলছে। সাধারণ মানুষ অসহায়ভাবে সব দেখছেন। মানুষের এই নীরবতা যে ঝড়ের সঙ্কেত নেত্রী যত তাড়াতাড়ি বোঝেন ততই রাজ্যের মঙ্গল।

ইসলামিক ফতোয়াবাজরা গণতন্ত্রের সামনে বড় বিপদ

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

ইমাম বরকতি ফতোয়া জারি করেছেন। ঢাকায় নয়, করাচিতে নয়, খোদ কলকাতায় বসে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছেন ইমাম বরকতি। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, লেখক এবং ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধা তারেক ফতেহ্-র জিভ যে কেটে নিতে পারবে— তাকে ইনাম দেওয়া হবে। এই ইনামও ইমাম ঘোষণা করেছেন। তারেক ফতেহ্-র অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। নাহ্, এটাও ঢাকা বা করাচির ঘটনা নয়। খোদ কলকাতাতেই তারেক ফতেহ্-র অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। নবি দিবস পালন করতে হবে— এই দাবিতে, হ্যাঁ, এই পশ্চিমবঙ্গেরই তেহট্টে একটি বিদ্যালয়ে হাঙ্গামা চালানো হয়েছে। হাওড়ার ধূলাগড়ে উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল মুসলমান মৌলবাদীদের হামলায় হিন্দুরা গৃহহীন হয়েছে। অবাধে লুঠতরাজ, এমনকী মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটেছে সেখানে। এইসব ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বিবেক জাগ্রত হয়েছে— এমন বলা যাবে না। এই রাজ্যের শক্তিশালী মিডিয়ামহল, যারা সর্বত্রই 'গৈরিকীকরণের ভূত' দেখছে— তারাও এইসব ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে--- তাও নয়। এইসব ফতোয়াবাজ এবং দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসন যে কঠোর হয়েছে— শক্ত হাতে তাদের দমন করেছে— একবারের জন্য তাও বলা যাবে না। বরং এরা সকলেই আপাতত শীতঘুমে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়ে নিয়েছে। তাহলে এইসব ঘটনায় প্রকৃত অর্থে হয়েছে কী? যা হয়েছে, তা হলো— এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক-সামাজিক পরিবেশটি একটি বড় প্রশ্ন এবং সংশয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যে ঘটনাগুলির কথা উল্লেখ করলাম সেগুলি যে সবার অজানা তা নয়। উল্লেখ করলাম এই কারণেই যে— এইসব ঘটনা একটি হিমশৈলের সামান্য আভাস মাত্র; এবং এইসব ঘটনাই গণতন্ত্রের পক্ষে চূড়ান্ত অশুভ, চূড়ান্ত বিপজ্জনক। কোনো সুস্থ, সামাজিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ফতোয়াবাজ এবং দাঙ্গাবাজদের দাপট চলে না। মৌলবাদের দাপটও কখনও গণতন্ত্রের পক্ষে কাম্য নয়। ফতোয়াবাজদের দাপটের সামনে যখন প্রশাসন, পুলিশ এবং সমাজের বিশিষ্ট অংশ মাথা নত করে, ভয়ে নিবীর্য হয়ে পড়ে— তখন বুঝতে হবে, সেই সমাজে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোটিই ধ্বংস হতে বসেছে। ইমাম বরকতির মতো ইসলামিক মৌলবাদের এক প্রতিনিধি যখন খোদ কলকাতায় বসে একের পর এক ফতোয়া জারি করার সাহস দেখাতে পারেন; ধূলাগড়ে, তেহট্টে দাঙ্গাবাজরা যখন অবাধে তাণ্ডব করতে পারে এবং এদের বিরুদ্ধে কোনোরকম দৃঢ়তাই যখন প্রশাসন

তসলিমা নাসরিন

তারিক ফতেহ্

> **কোনো সুস্থ, সামাজিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ফতোয়াবাজ এবং দাঙ্গাবাজদের দাপট চলে না। মৌলবাদের দাপটও গণতন্ত্রের পক্ষে কাম্য নয়। ফতোয়াবাজদের দাপটের সামনে যখন প্রশাসন, পুলিশ এবং সমাজের বিশিষ্ট অংশ মাথা নত করে, ভয়ে নিবীর্য হয়ে পড়ে— তখন বুঝতে হবে, সেই সমাজে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোটিই ধ্বংস হতে বসেছে।**

দেখাতে পারে না; সমাজের বিশিষ্টজনেরাও যখন নীরবতা অবলম্বন করেন— তখন বলতেই হবে বাংলার গণতন্ত্র আজ সত্যিই বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

ইমাম বরকতির মতো ইসলামি ধর্মগুরু এবং নেতারা কখনই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল নন। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এঁদের কাম্যও নয়। এঁরা চান, গণতন্ত্রের পরিবর্তে শরিয়তি ব্যবস্থা চালু করতে। যে ব্যবস্থায় নিত্য-নতুন ফতোয়া জারি করা যাবে এবং যে ফতোয়ার প্রতিবাদের একটিই শাস্তি— মৃত্যু! শরিয়তি ব্যবস্থা কখনই গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না। এর সব থেকে বড় উদাহরণ ইসলামিক রাষ্ট্রগুলি। সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতিকে গলা টিপে হত্যা করার ঘটনা সবথেকে বেশি এই ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতেই। সৌদি আরবের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে এই ইসলামিক

রাষ্ট্রগুলিতে কোন ব্যবস্থা চালু রেখেছে শরিয়ত। সৌদি আরব সমগ্র বিশ্বে গোঁড়া মুসলমানদের কাছে আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। এই সৌদি আরবে নারীর ভোটাধিকার নেই, বোরখা পরা বাধ্যতামূলক, ঘরের বাইরে পা রাখার অধিকার নারীর নেই, অ-মুসলমানদের নিজ নিজ ধর্মাচরণের অধিকার নেই, অন্য ধর্মের উপাসনাস্থল নির্মাণ বা শোভাযাত্রা বের করার অধিকার নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অমানবিক ব্যবস্থাই এখানে, এই গণতান্ত্রিক ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে চালু করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ফতোয়াবাজ ইমাম এবং দাঙ্গাবাজ ইসলামি মৌলবাদীরা।

গণতন্ত্রের সামনে এই বিষবৃক্ষটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ২০০৭ সালে। ওই বছর কলকাতার পার্কসার্কাস অঞ্চলে তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের দাবিতে কিছু মৌলবাদী ধর্মগুরু এবং রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্বে উগ্র-উচ্ছৃঙ্খল এক শ্রেণীর মুসলমান তাণ্ডব শুরু করে। এই রাজ্যের ক্ষমতায় তখন বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের সাহস হয়নি এইসব ফতোয়াবাজদের কঠোর হাতে দমন করার। বরং, ফতোয়াবাজদের দাবি মেনে নিয়ে তসলিমাকে বিতাড়ন করেছিল তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার। এমনিতেই বামফ্রন্ট সরকার তার সাড়ে তিন দশকের শাসনকালে এই রাজ্যে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছিল নির্মমভাবে। তার উপর ফতোয়াবাজদের সামনে এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ গণতন্ত্রের সামনে ভবিষ্যতের আর একটি অশুভ সংকেত ডেকে এনেছিল সেদিন। বামফ্রন্ট সরকারের বিদায়ের পর বর্তমান সরকার সম্পূর্ণভাবেই নতজানু হয়েছে এই ইসলামিক মৌলবাদীদের সামনে। তাদের নিত্য-নতুন আবদার, নিত্য-নতুন ফতোয়া নির্বিচারে মেনে নিচ্ছে তারা। আর তার ফলেই এই রাজ্যের ফতোয়াবাজ ইসলামি ধর্মগুরুরা কখনও বলছেন— 'আমরা ২৭ শতাংশ, আমরাই ঠিক করব কে এখানে সরকার করবে।' আবার কখনও বলছেন— 'আমাদের পছন্দ করা ব্যক্তিই মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসবেন।' এবং যত দিন যাচ্ছে, এঁরা যত উচ্চকিত হচ্ছেন, আগ্রাসী হচ্ছেন— ততই বিপদ আরও ঘনিয়ে আসছে গণতন্ত্রের প্রতি।

কেমন বিপদ? মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যদি ঘোরেন, তাহলে দেখতে পাবেন নিত্য-নতুন তালিবানি ফতোয়া জারি করা এখন সেখানে ইমাম-মৌলবিদের নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙার দোলুয়া গ্রামে 'কার্তিক লড়াই' একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। প্রতি বছর কার্তিক পুজোর সময় এই অনুষ্ঠানটি হয়। বছর দুয়েক আগে ইসলামিক মৌলবাদীরা ফতোয়া জারি করে এই গ্রাম দিয়ে কার্তিক মূর্তি নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। তারও আগে, ২০১০ সালে বেলডাঙার ঝাউবোনা হাইস্কুলে সরস্বতী পুজো করা চলবে না বলে ফতোয়া জারি করে মৌলবাদীরা। স্কুল কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন, সকলেই সেই ফতোয়া নীরবে মেনে নেয়। এই স্কুলেই পরে দাবি করা হয়, চারজন মুসলমান শিক্ষকের নমাজ পড়ার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। নমাজ পড়ার ঘর দিলে সরস্বতী পুজোও করতে

BANSIDHAR BADRIDAS MODI PRIVATE LTD

EDEN HOUSE

17/1, LANSDOWNE TERRACE

LANSDOWNE MANOHAR PUKUR CROSSING

KOLKATA - 700026

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

দিতে হবে— হিন্দু ছাত্ররা এমন দাবি করলে হাজার দশেক লোক জড়ো হয়ে ছাত্রদের মারধর করে। তিরিশটি হিন্দু পরিবারের ঘরবাড়ি ভাঙচুর, লুঠতরাজ হয়। পুলিশকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হয় না। ২০১২ সালে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বাছড়া গ্রামে লক্ষ্মীপুজোর ভাসান আটকে দেওয়া হয়। গ্রামের রাস্তা দিয়ে লক্ষ্মীপুজোর ভাসান নিয়ে যাওয়া যাবে না ফতোয়া দেয় ইমাম-মৌলবিরা। বেলডাঙারই অন্তর্গত আমতলা হাইস্কুলে জনৈক শিক্ষক অবসর গ্রহণের পর নিজ অর্থে স্কুলচত্বরে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। মৌলবিদের ফতোয়ায় তিনি সে কাজ করতে পারেননি। নপুকুড়িয়া নতুনপাড়া বিদ্যালয়ে সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে স্কুলের প্রাচীরে মনীষীদের মূর্তি বসানো হয়েছিল। মৌলবিদের ফতোয়ায় সেইসব মূর্তি ভেঙে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত তিন-চার বছরে বেলডাঙা অঞ্চলে তালিবানি ফতোয়ায় অন্তত চার-পাঁচটি স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দিতে হয়। পরে অবশ্য হাইকোর্টের আদেশে পুজো চালু হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জে জনৈক ঘোষ পরিবারের মহিলারা উঠোনে আলপনা দিলে তা ইসলামবিরোধী এই আওয়াজ তুলে আলপনা মুছে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বহরমপুর শহরের গোরাবাজারে একটি বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা তিনটি মুসলমান পরিবারের আপত্তিতে ওই বহুতলের বাসিন্দা হিন্দু পরিবারগুলিকে সন্ধ্যাবেলা শাঁখ বাজানো বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এ শুধু মুর্শিদাবাদ জেলার চিত্র। নদীয়া, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশপরগনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরলে এরকম বহু অমানবিক, গণতন্ত্রবিরোধী, বর্বর ফতোয়ার সংবাদ কানে আসবে এবং ফতোয়াবাজদেরও নজরে পড়বে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কোন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গ থেকে তার অবনমন কি হচ্ছে শরিয়তি পশ্চিমবঙ্গে? গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শান্তিতে নিজ নিজ ধর্মাচরণ করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকেরই আছে। কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গেই যখন ইমাম-মৌলবিরা ফতোয়া দিয়ে সেই অধিকার কেড়ে নিতে চায়— তখন গণতন্ত্র সুরক্ষিত এ কথাটি কি পশ্চিমবঙ্গের জন্য খাটে? দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই ফতোয়াবাজদের দাপটে এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাটি যখন ধ্বংসের পথে চলেছে— তখন সেই বিপদ সম্পর্কে এই রাজ্যের সংবাদমাধ্যম, যারা গণতন্ত্রের 'ফোর্থ এস্টেট' হিসাবে চিহ্নিত, তারা এবং বাঙালি শিক্ষিত-বিদগ্ধ মহল কেউই কিন্তু সচেতন নয়। এমনকী এখনও পর্যন্ত এই ফতোয়াবাজদের খপ্পর থেকে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করার সদিচ্ছা তাদের ভিতর দেখা যায়নি। প্রাক্-স্বাধীনতা লগ্নে এই বাংলার সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী ভূমিকা ছিল। দেশের মুক্তি সংগ্রামে তখন চালিকাশক্তির কাজ করেছিল বাংলার পত্রপত্রিকা। আজ বাংলার গণতন্ত্রকে ফতোয়াবাজদের দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হতে দেখলেও এখানকার সংবাদপত্রের 'রা ফোটে না। এরা দাদরি নিয়ে বিপ্লব করতে পারে, ধূলাগড়ে ইসলামিক মৌলবাদীদের তাণ্ডবের সংবাদ চেপে যায়। এঁরা প্রতিদিন 'গৈরিকীকরণের ভূত' দেখেন, অথচ ইমাম বরকতির ফতোয়ায় অন্যায় খুঁজে পান না। কার স্বার্থে, কাদের অন্যায় আড়াল করতে এরা পরিচালিত হন— ইতিহাস নিশ্চয়ই একদিন তা খুঁজে বের করবে।

ততোধিক লজ্জানক অবস্থান বাংলার শিক্ষিত-বিদগ্ধ সমাজের। এই শিক্ষিত সমাজ অনায়াসে সত্যকে অস্বীকার করতে এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপশ করতে শিখেছেন। অতএব, বরকতির ফতোয়ার প্রতিবাদে এঁদের কাউকে সরব হতে দেখা যায় না। এঁরা এই সত্যটি বুঝছেন না যে, ইসলামি মৌলবাদ তার থাবা আরও প্রসারিত করলে এঁরাও নিশ্চিন্তে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করতে পারবেন না। আজ তারেক ফতেহ্-এর নামে ফতোয়া জারি হচ্ছে— কাল যে এঁদের নামেও জারি হবে না— তার নিশ্চয়তা কোথায়? এঁরা যেন ভুলে না যান--- বাংলাদেশে যে হিন্দু ব্লগাররা খুন হয়েছেন— তাঁরা কিন্তু নিজেদের নাস্তিক পরিচয় দিয়েও রেহাই পাননি। কাজেই আজ যে বাঙালি হিন্দু কবিটি প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোমাংস ভক্ষণ করে বাহবা কুড়োলেন--- ফতোয়াবাজদের কাছে তাঁর পরিচয় কিন্তু কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, তৃণমূল বা নাস্তিক নয়। ফতোয়াবাজদের কাছে তাঁর শেষ পরিচয় তিনি একজন হিন্দু। কাজেই আমাদের নীরবতা যদি ফতোয়াবাজদের উৎসাহ দেয়; শরিয়তি ব্যবস্থা কায়েম করার পথ সুগম করে পশ্চিমবঙ্গে— তবে এটাও যেন আমরা মেনে নিই, আমাদের ধন-মান-জীবনও আর এখানে সুরক্ষিত নয়।

কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গ চেয়েছিলাম নাকি আমরা? গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তে শরিয়তি পশ্চিমবঙ্গ? শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মুক্তচিন্তার এক স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্ন দেখেই মুসলিম লিগের উগ্র মৌলবাদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন এই বাংলাকে। আজ যদি শ্যামাপ্রসাদের সেই পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হই— তবে তা হবে ক্ষমার অযোগ্য এক অপরাধ। তাহলে কী করতে হবে আমাদের? এর উত্তর দিয়ে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ১৩৩৩ সনের মাঘ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' শীর্ষক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই, তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্যও, প্রতিবেশীর জন্যও, আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি 'তোমরা ক্রূর হয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না'— কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলের বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিই আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিই আসে— কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো একটা উপলক্ষ নিয়ে পরস্পর কৃত্রিম বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্য তা হয় না। যে মাটিতে কন্টকতরু ওঠে সে মাটিকে যতক্ষণ শোধন না করা হয় ততক্ষণ তো কোনো ফল হবে না।'

এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের পটভূমি

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

আগে বলা হোত স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা পাওয়ার আগে ২৬ জানুয়ারি ছিল সারা ভারতের দেশানুরাগী সংগ্রামীদের আত্মশক্তি প্রকাশের দিন। নানা স্থানে সাহসী স্বপ্নদর্শী সংগ্রামী বীররা ভোর থাকতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতেন— ব্রিটিশ-রাজশক্তি সহ্য করত না; পুলিশ এসে নামিয়ে দিত পতাকা। বদলে ওড়াত 'ইউনিয়ান জ্যাক'। এইভাবে ২৬ জানুয়ারি আমাদের দেশে এক দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে।

১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি সংবিধান প্রকাশিত হলো। সংবিধান অনুসারে আমাদের রাষ্ট্রপরিচয় হলো স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র। পরবর্তী সময়ে একটি অবান্তর সংযোজন হয়েছে কংগ্রেস-শাসন পর্বে। দুটি নতুন বিশেষণ জোড়া হয়েছে— ধর্মনিরপেক্ষ আর সমাজতান্ত্রিক। বলাবাহুল্য ১৯৫০-এ গৃহীত পবিত্র সংবিধানের সূচনাংশেই ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান বিচার, চিন্তা-মত প্রকাশ-বিশ্বাস-ধর্ম আর উপাসনার স্বাধীনতা, অবস্থা বা সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্য, ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও দেশীয় অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে সহমর্মিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি। এই justice, Liberty, equality, fraternity-র পাশে অন্য দুই বিশেষণ— সোস্যালিস্ট আর সেকুলার শব্দ দুটি যোগ করা হয় ১৯৭৬-এ ৪২-তম সংবিধান-সংশোধন মারফৎ (এটি ৩ জানুয়ারি ১৯৭৭-এ কার্যকর হয়)। আমাদের মতে এই সংশোধন অবান্তর আর উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

সমাজতন্ত্র একটি বাতিল আদর্শ। ভারতরাষ্ট্র আধুনিক সমাজতন্ত্র নয়— এ রাষ্ট্রের আসল চরিত্র হলো গণকল্যাণমুখী (বা কল্যাণমুখী) রাষ্ট্র। দেশের সমস্ত মানুষের সম্মিলিত সম্পদ, নির্ধন-নির্বল-প্রান্তিক- অবদমিতদের কাছে যথাসম্ভব পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। আধুনিক সমাজতন্ত্র নয় এ হলো ভারতের চিরাচরিত জীবননীতি-সমাজ আদর্শের অন্তর্গত। একে বলা যায় একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থার প্রাচীন আদর্শের নব রূপায়ণ। এতে সবাই সাধ্যমতো শ্রম দান করে সম্পদ সংগ্রহ করবে— প্রয়োজন মতো সেই সম্পদের ভাগ পাবে। আমাদের চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থাও ছিল তেমনি। এখানে বর্ণ ও বর্ণে বিভাজিত সমাজ, সংস্কার ও যোগ্যতা অনুসারে অংশগ্রহণ করার আর প্রয়োজন অনুসারে প্রতিপালিত হবার সুযোগ প্রদান করত। স্বামী বিবেকানন্দ একে 'হিন্দু-সমাজতন্ত্র' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মুসলমান শাসনের পর্বে এই অবস্থার বদল হয়। তীর্থকর বা জিজিয়া সহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ঘৃণা-অত্যাচার বা শোষণের ব্যবস্থা চালু হয়। ব্রিটিশ-শাসনে অবস্থা কিছু সহনীয় হয়, তবে শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রেই তাদের ভূমিকা গৌরবজনক ছিল না। সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার— ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রান্তিক করা তাদের একটি বড় কাজ। যাইহোক সমাজতন্ত্র শব্দটি সংযোজনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসি রাজনীতির আদর্শগত দীনতা এমনকী দেউলিয়াপনাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ আসলে রাশিয়া (এমনকী চীনও) থেকে ধার করা আদর্শের ছায়া বলেই মনে হয়। এতে স্বাভাবিক ভাবেই বামপন্থীদের সাহায্য ও সমর্থন আছে। একথা তো ঠিক, মুখে যতই কংগ্রেস-বিরোধিতার কথা বলুন, ভারতের বামপন্থীরা যে-কোনো সংকটে কংগ্রেসকে সমর্থনই করে এসেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আরও বিপজ্জনক। ভারতে সংখ্যাগুরুর ধর্ম হিন্দু— হিন্দুধর্মে বলপূর্বক ধর্মান্তরণের ধারণা নেই; সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে বিরোধের কোনো সম্ভাবনাই নেই। বরং মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত ইহুদি-ছাড়া অন্য ধর্ম দুটির মধ্যে ধর্মান্তরণের প্রতি উৎসাহ আর বিভিন্ন ধরণের বিধি আছে। বিশেষত মুসলমানদের পক্ষে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে থাকা ধর্মনীতিগত ভাবেই সম্ভব নয়। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা তাদের চিন্তা আদর্শ ও কর্মকাণ্ডে আপন (believer) আর অপরের ধারণায় বিশ্বাস রাখেন। ফলে তাদের পক্ষে অন্যধর্মের মানুষকে সমান ভাবা কঠিন। যে ভারতীয় আদর্শ মহামতি অশোক তাঁর শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করেছেন— সব মনুসে পজা মম (অর্থাৎ সব মানুষই আমার প্রজা)— সেই আদর্শ সংবিধানের সূচনাংশে সুস্পষ্ট ছিল। হিন্দু সমাজ বেদান্তে বিশ্বাসী— 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' আমাদের আদর্শ, সুতরাং মানুষে মানুষে ভেদ আমাদের ধর্ম সঙ্গত নয়। তাহলে কোন বিচিত্র ধারণা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে আমদানি করল! ভারতে হিন্দুদের আলাদা করে ধর্মনিরপেক্ষতার পাঠ দেবার দরকার নেই।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান মুসলমান-রাষ্ট্র হয়েছে। সামান্য কিছুদিন পূর্বপাকিস্তান স্বতন্ত্র-স্বাধীন হবার পর ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে আত্মঘোষণা করেছিল। বাংলাদেশের সংবিধান থেকে সেই শব্দ বাদ গেছে— এখন সেই সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে সে দেশ ইসলামে বিশ্বাসী, তার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াল এইরকম, ভারত ভেঙে তিনটি দেশ হলো— দুটি দেশ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বলে গ্রহণ ও ঘোষণা করল, আর আমরা আমাদের সংবিধানে বিশেষভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ঘোষণা করলাম! এই প্রবণতা সংবিধানের মূল সুরকে বিকৃত করছে।

সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা, অধিকার ও সম্পর্কের বিন্যাস সুস্পষ্ট। কেন্দ্র রাজ্যের ক্ষমতা ও অধিকার অস্বীকার করতে পারে না; রাজ্যও বিপরীতক্রমে কেন্দ্রের বিরোধিতার ক্ষেত্রে বেলাগাম স্বেচ্ছাচার করতে পারে না। কিছুদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে তেমন কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা চোখে পড়ছে। সংবিধানের ২৫৬ থেকে ২৬০ পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলিতে এসম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। অথচ রাজ্য সরকার যেসব বিচিত্র আচরণ করছে তাতে তাকে ভারতের পবিত্র সংবিধান ও দেশ শাসনের মৌলিক বিধি বা পরম্পরাকে অস্বীকার করার স্বেচ্ছাচারিতা বলা ছাড়া উপায় থাকে না।

২৫৭-এ অনুচ্ছেদটি ২০ জুন ১৯৭১-এ সংবিধানের ৪৪তম সংশোধন করার পর রচিত হয়েছে। ২৬০ অনুচ্ছেদের সংশোধন হয় ১৯৫৬-তে (৭ম সংশোধন)। দুটি অনুচ্ছেদেই রাজ্যে সুরক্ষাবল বা সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে। নভেম্বর মাসে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ হৈচৈ শুরু করলেন, সেনাবাহিনী নাকি তাকে না জানিয়ে রাজপথের শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রগুলি দখল করে নিয়েছে! এর প্রতিবাদে তিনি রাজ্যের মুখ্য দপ্তর

'নবান্ন'-তে রাত কাটালেন! পরে জানা গেল, এটি ছিল নিছক একটি কর্তব্যসাধন! প্রতি বছরই এরকম ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব-উত্তর ভারতে বহু রাজ্যে এরকম হয়েছে— কোনো রাজ্য থেকে কেউ আপত্তি করেনি। আমাদের অব্যবস্থিত চিত্ত মুখ্যমন্ত্রী তাই করলেন! উপরন্তু, তাঁর মন্তব্য শোনা গেল, সেনাবাহিনীর লোকজন নাকি যানবাহনের চালকদের কাছে টাকা আদায় করছেন! বলা হলো, 'নবান্ন'-এর কাছে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর শুল্ক-আদায় কেন্দ্র 'দখল' করার লক্ষ্য নাকি 'ক্যু' করার মতলব! আর সর্বোপরি, অভিযোগ তোলা হয়— সেনাবাহিনী এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে কিছুই জানায়নি!

'ক্যু' বা 'ক্যু-দেতা' শব্দ সম্পর্কে কিছুমাত্র ধারণা থাকলে একথা বলতেন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী! এই সামান্য ব্যাপারটিকে সেনা-অভ্যুত্থান বলার অর্থ তাঁর মানসিকতার প্রতিফলন হতে পারে কিন্তু রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের প্রধানের পক্ষে এমন কথা, সেনাবাহিনী বা মুখ্যমন্ত্রী কারো গৌরবই বাড়ায়নি। ফোর্ট-উইলিয়াম থেকে ভারপ্রাপ্ত জওয়ান জানালেন, এনিয়ে রাজ্যের পুলিশের সঙ্গে তাদের চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া হয়েছে। তাদের ইচ্ছা ছিল, অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে এ কাজ করবেন, কিন্তু রাজ্য-পুলিশের অনুরোধ মেনেই তারা তারিখ বদলেছেন। অর্থাৎ ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সঙ্গে এই নাকা-ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। 'নোটবন্দি' আর 'নাকাবন্দি'-র সম্পর্ক টানা উর্বর মস্তিষ্কের কদর্য রাজনীতি ছাড়া কিছু নয়!

আমাদের সীমানা রক্ষা করছেন যে বীর জওয়ানরা, দেশে যে-কোনো ধরনের বিপর্যয়ের সময় যাদের সাহায্য ছাড়া আমাদের দেশবাসীর কোনো উপায় থাকে না, যারা কোনোভাবেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, তাদের এমনভাবে অপমান করা অত্যন্ত নক্কারজনক ঘটনা। নিন্দা করার কোনো ভাষাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

একই সঙ্গে আমাদের নিশ্চয় স্মরণে আছে মাত্র একুশ বছর বয়সে নিহত বিমানবাহিনীর তরুণ জওয়ান অভিমন্যু গৌড়ার কথা। গত বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের পূর্বদিন— সামরিক বাহিনীর কুচ-কা-আওয়াজ চলার সময় এক উচ্ছৃঙ্খল 'হঠাৎ নবাব' তৃণমূল নেতার আদুরে মদ্যপ পুত্র বহুমূল্য একটি গাড়ি চালিয়ে অভিমন্যুকে হত্যা করে। এই পথে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত ছিল— কার্যত নিষিদ্ধ এই এলাকায় সারারাত নৈশ-ক্লাবে ফুর্তি করে এসে অভিমন্যুকে যারা হত্যা করল, রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে— এখনও জানা নেই।

রাজ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় হিন্দু জনসাধারণের উৎসব-ধর্মাচরণ-দেবস্থল-পূজানুষ্ঠান এমনকী জীবন ও সম্পত্তির উপর মুসলমানদের সীমাহীন অত্যাচার সংগঠিত হচ্ছে। চোপড়া অঞ্চলে রথযাত্রা বন্ধ করে রথ ভেঙে দুষ্ট সমাজবিরোধীরা আওয়াজ তুলেছে : 'দিনাজপুর দিনাজপুর/হিন্দুরা সব হও দূর'। ক্যানিং-এ দুষ্কৃতীদের মধ্যে সংঘর্ষে মৃত এক পিস্তলধারী মোল্লার মৃত্যুর পর কলকাতার মুসলমান-অধ্যুষিত পাড়ার বদমায়েস-বাহিনী দোকান-বাজার লুঠ করেছে— সেই হামলার সময় একটি জায়গায় বসে চা খাচ্ছিলেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এই রাজনৈতিক ব্যক্তিটি সংখ্যালঘুর উন্নয়নকে সংখ্যাগুরুর ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু নিশ্চয় ভাবেন না। কালিয়াচকে অবৈধ পোস্ত-চাষ আর জালটাকার কারবারিরা হঠাৎ হিন্দু মন্দির ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করে শেষ পর্যন্ত থানা আক্রমণ করে ত্রাস সঞ্চার করেছে! পুলিশ কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। ব্যারাকপুরের কাছে হাজিনগরে দুর্গাপুজো মণ্ডপে আক্রমণ করেছে মুসলমান-ধর্ম-ধ্বজাধারীরা। মল্লারপুর অঞ্চলে অভিজিৎ দত্ত নামের এক তরুণকে মহরমের চাঁদা হিসাবে চাওয়া বড়সড় অঙ্কের দাবি পূরণ করতে না পারায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কাটোয়ার কাছে একটি গ্রামীণ শিব মন্দিরে গোমাংস ফেলে গেছে মুসলমান দুষ্কৃতীর দল। উলুবেড়িয়ার কাছে তেহট্ট হাইস্কুল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। সেখানে 'নবী দিবস' পালন করতে দেবার দাবি করেছে স্থানীয় মুসলমানরা। নবী দিবস পালন করার অনুমতি না পেলে তারা কী করতে পারে তাও দেখা গেল। পাকিস্তানের পতাকা উড়ল স্কুল চত্বরে। প্রকাশ্যে ঘোষণা হলো, এবার থেকে সরস্বতীপুজো করা যাবে না।

ধুলাগড়ের ঘটনা নিয়ে সবিস্তারে পরে কখনো লেখা যাবে। এখানে লিখি ধুলাগড়ে ভয়ঙ্কর যে ঘটনা ঘটল তার তুলনা স্বাধীন ভারতে বেশি নেই। এর তুলনা এখন চলতে পারে একমাত্র উত্তরপ্রদেশের মেহেরানা গ্রামের সঙ্গে। সেখানেও হিন্দুরা উৎখাত হয়েছেন। সংবিধান দেশে সব ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষকে বেঁচে থাকার অধিকার--- সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দিয়েছে, সেখানে এরকম ঘটনা শুধু আইন-কানুনের সমস্যা নয় শাসকদলের দৃষ্টিগুলির সমস্যা। ধুলাগড়ের ব্যানার্জী পোলের মানুষজন বাড়িঘর দোকান ব্যবসা মন্দিরে দেখেছেন এক তরফা লুঠতরাজ ও অগ্নি সংযোগ। শতাধিক বাড়ি নিশ্চিহ্ন করেছে নবী-দিবস পালনের ধর্মধ্বজাধারীর দল। তারা সরকারি দলের সংখ্যালঘু সেল-এর উৎসাহী সমর্থক! লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি হারিয়েছেন হিন্দুরা। স্থানীয় বিধায়ক শাসক দলের নির্দেশে নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। পরে মন্ত্রীকে নিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে পরিবার পিছু ৩৫ হাজার টাকা। অথচ বিষমদ খেয়ে মারা গেলে দু-লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষিত হতে দেরি হয় না।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে ভারতবর্ষ জুড়ে আনন্দ-উৎসব চলবে। আমরাও দেখব রেডরোডের কুচ-কা-আওয়াজ। উড়বে জাতীয় পতাকা। কিন্তু রাষ্ট্রকে দুর্বল করার ভয়ঙ্কর চক্রান্ত আর তার পরিণতি— খাগড়াগড়-কালিয়াচক-পিংলা-নানুরে একের পর এক বিস্ফোরণ আর মুসলমান তোষণের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে বাংলা এখন শাসিত হচ্ছে কালাপাহাড়ের নতুন অবতারদের মাধ্যমে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার দিকে কেন্দ্র সরকারের বিশেষ নজর না দিয়ে আর বোধহয় উপায় নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে ভয়াবহ এই সংবিধান বিরোধিতা, ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা আর সেনাবাহিনীর অপমান মেনে নেওয়া উচিত হবে না। বিমুদ্রাকরণের বিরোধিতা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে ধর্না দেওয়াও কেন্দ্র সরকারের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা আর রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বলে মনে করি। এসব অপরাধের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হবে প্রজাতন্ত্র দিবসে এবারের কর্তব্য।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতীয় গণতন্ত্র কি সংকটের মুখে?

কে. এন. মণ্ডল

ভদ্রলোকদের রাজনীতিতে ধরে রাখা ও বিশিষ্টদের রাজনীতিতে আকৃষ্ট করতে হোলে রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করতেই হবে। একাজে নির্বাচন কমিশনকে ওজনদার নেতা-নেত্রীদের হুমকি অগ্রাহ্য করে আরো কঠোরভাবে নির্বাচন বিধি প্রয়োগ করতে হবে। তবেই সাধারণের পক্ষে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্ভয়ে শামিল হওয়া সম্ভব হবে।

'ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র'—আমাদের দাবি। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু কিতাবি দাবির সাথে বাস্তবের মিল কতটা? জনসংখ্যার নিরিখে এবং ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লিখিত দলিল হওয়ার কারণেও যদিও দাবিটিকে পত্রপাঠ নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পদে পদে গণতন্ত্র ধর্ষিত হচ্ছে, শুধুমাত্র নিয়মমাফিক পালা করে ভোটপর্ব অনুষ্ঠিত হওয়া ছাড়া। যদিও ভারতীয় সংবিধানের ছত্রে ছত্রে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি—যার সফল প্রয়োগে ভারতবর্ষ নিশ্চিতভাবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের শিরোপা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু নানা বিষয়ে পি.এইচ.ডি. করা বিশিষ্ট আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ ভারতের সংবিধানের প্রাণপুরুষ ড. বি. আর আম্বেদকর কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন তাঁদের বহুদিনের পরিশ্রমের ফসল 'ভারতীয় সংবিধানের' এই পরিণতি হবে? কাজের পরিধির চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্ষমতার বিভাজন করে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে যেমন আলাদা করা হয়েছিল, তেমনি আবার কতকগুলি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করার উপায় রেখেছেন সংবিধান প্রণেতাগণ। এগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'ভারতের নির্বাচন কমিশন'। যেহেতু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা দেশ শাসন করবেন, তাই নির্বাচনে সকল মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত। আর এই আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে কার্যকর রাখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন থাকাটা জরুরি। যার সংস্থান রয়েছে ভারতের সংবিধানে। তাইতো, ভারতের সবচেয়ে সফল প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টি. এন. শেষণ বুক ফুলিয়ে বলতে পেরেছেন 'I am the Chief Election Commissioner of India—not of Govt. of India.' অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য, 'ভারতীয় রাষ্ট্রের কাছে (মানুষের কাছে), ভারত সরকারের কাছে নয়'। শ্রীশেষণ ভারতের নির্বাচন কমিশনকে যে মর্যাদার জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, অনেকের মেরুদণ্ডহীনতা পরবর্তীকালে তার স্খলন ঘটিয়েছে।

সাম্প্রতিক অতীতে দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে, এমনকী বিহারের বিধানসভা নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, রাজ্য প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনার ভার থেকে রাজ্য সরকারের আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনের উপর, তারাই নির্বাচন কমিশনের চক্ষু-কর্ণ। যেখানে রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের অনেকেই রাজনৈতিক প্রভুদের পদলেহনে নিবেদিত প্রাণ, সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ প্রশাসনের আশাই বৃথা। বর্তমান বাংলায় এই পদলেহন এমন বে-আব্রু পর্যায়ে নেমে এসেছে যা যে কোনোও বিবেকবান মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া দুষ্কর। ক্ষমতাসীনদের স্বার্থরক্ষা হলে ঘুষকাণ্ডে অভিযুক্ত হয়েও পুলিশ অফিসার চাকুরিতে

প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টি এন শেষণ

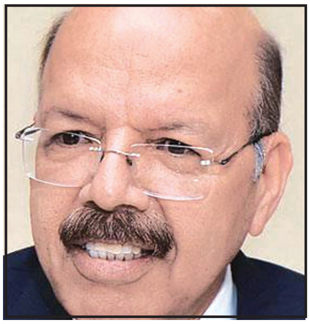

বর্তমান নির্বাচন কমিশনার নাসিম জাইদি

বহাল থেকে যান। রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি কি জানেন না যে নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গের নোটিশের জবাব প্রার্থীকেই দিতে হয়? তাহলে এটা শুধুই কী অজ্ঞতা না ভাবের ঘরে চুরি? তাহলে কি ধরে নিতে হবে সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ পদ্ধতিতে গলদ রয়েছে অথবা Orientation training ক্রটিপূর্ণ? না এটা সার্বিক অবক্ষয়ের ধারা? ১৯৮০ সালে WBCS (Exe) পরীক্ষা পাশ করেও পরিবারের আপত্তিতে ব্যাঙ্ক অফিসারের চাকুরিতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল এখন মনে হচ্ছে।

আমি মনে করি সর্ষের মধ্যে ভূতের নাচানাচি বন্ধ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে আরো কঠোর হতে হবে---প্রয়োজনে নির্বাচনের বিধি পাল্টানোর ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর পক্ষপাতদুষ্ট শাস্তিপ্রাপ্ত (condemned) কোনও অফিসার তার পুরোনো জায়গায় ফিরে যাবেন না এবং শাস্তির ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট অফিসারের সার্ভিস বুকে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রাখতে হবে—যা তার পরবর্তী পদোন্নতি ও নিয়োগের সময় গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। এটা করা হোলে মেরুদণ্ডহীন অফিসারেরাও আইন লঙ্ঘনের আগে দু'বার ভাববেন। কেননা তাদের পদলেহনের একমাত্র কারণ পদোন্নতির আশা এবং ভাল পোস্টিং। রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন ও গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়নে এ ধরনের দমদমি দাওয়াই খুবই কার্যকর হতে পারে। তবে ভদ্রলোকদের রাজনীতিতে ধরে রাখা ও বিশিষ্টদের রাজনীতিতে আকৃষ্ট করতে হোলে রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করতেই হবে। একাজে নির্বাচন কমিশনকে ওজনদার নেতা-নেত্রীদের হুমকি অগ্রাহ্য করে আরো কঠোরভাবে নির্বাচন বিধি প্রয়োগ করতে হবে। তবেই সাধারণের পক্ষে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্ভয়ে শামিল হওয়া সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক প্লেটোর একটি উক্তি যা ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী কে.আর. নারায়ণন ৩১ আগস্ট ১৯৮০ সালের রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত দিল্লির একটি সভায় উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, 'অপরিচ্ছন্ন এই অজুহাতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি অবজ্ঞাভরে অবহেলা করলে সর্বাধিক যে মূল্য দিতে হয়, সেটা হলো নিকৃষ্টতর মানুষ কর্তৃক শাসিত হওয়া।' আমরা কি একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে? গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে আমরা কি এরকম এক স্বৈরাচারী শাসনের আবহ লক্ষ্য করছি না? কবিগুরুর 'প্রশ্নের' কি সফল রূপায়ণ হচ্ছে বাংলায়? চারিদিকে নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস কি শান্তির পথরোধ করে দাঁড়িয়ে? দুঃশাসনদের দাপাদাপিতে চারিদিকে ভয়ার্ত পরিবেশ থেকে মুক্তির উপায় কী? দুর্যোধনদের তবু অপরাধবোধ ছিল—দুর্যোধন বলেছিলেন, 'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম ন চ মে নিবৃত্তিঃ' (অর্থাৎ ধর্ম-অধর্ম কী জানি, তবু অধর্মের পথ পরিহার করতে পারছি না)। বর্তমানে অপরাধীরা সব অভিযোগ চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দেন। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এই ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করলে ক্ষমতাবানরা তাদের নোংরা ভাষায় প্রতিআক্রমণ করে সব প্রতিবাদী কণ্ঠকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলছে। তাই আজ সমাজের বিবেক পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকায়, তার সুযোগ নিচ্ছে অসাধু রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। আর তার একটাই কারণ—'নঙ্গেসে খ ুদাভী ডরতে হ্যায়।'

তাহলে উপায়? প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে। সমস্যা থেকে মুখ লুকিয়ে থাকলে বিপদ আরো বর্ধিত আকারে সকলকে আঘাত হানবে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, প্রয়োজনে প্রতিরোধ। উন্নত মানুষই একটি উন্নত সরকার উপহার দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে জোসেফ মেসট্রোর (ফরাসি দার্শনিক) একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য, 'একটি জাতি তাদের উপযুক্ত সরকার পায়'। গণতন্ত্রে এই 'উপযুক্ততার' বিশাল তাৎপর্য। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় মানুষ বিশ্বাস হারালে নেমে আসবে নৈরাজ্য ও অরাজকতা। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই সংকটে আপনি-আমি- সকলে ভূমিকা পালন করতে পারি।

[লেখক এস বি আই-এর অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক]

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India, Branch : Bidhan Sarani

চিঠিপত্র

নোট বাতিল ও বিরোধীদের ভূমিকা

৫০০ টাকা ও হাজার টাকার নোট বাতিল করাকে নিয়ে দেশের মধ্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। কালোটাকা ও জালনোট বাতিল করে সরকার দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে উদ্যত হয়েছে বলে সরকার পক্ষের দাবি। অর্থনীতিবিদরা বলেন, স্বল্প সময়কালীন মন্দা পরিস্থিতি ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হবে যদি সত্যিই কালোটাকা বা কালো অর্থনীতি নির্মূল করা যায়। দুর্নীতিবাজ-সহ উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির কাছেও প্রচুর মজুদ টাকা রয়েছে। এতে অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নিরাপত্তাও বিপদের সম্মুখীন। এমতাবস্থায় সরকারের যুক্তি হলো টাকা বাতিলের ব্যাপারটা খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। কিন্তু সরকারের এই যুক্তিকে বিরোধী দলগুলি কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। বিশেষ করে যে পদ্ধতিতে এই বাতিল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অবিজেপি দলগুলি তা মোটেই মেনে নিতে চাইছে না। জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় টাকা পাচ্ছেন না, কেউ কেউ ২০০০ টাকার দু-একখানা নোট পেলেও খুচরা করা সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণ গৃহস্থ পরিবার থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ী, বড় ব্যবসায়ী, শিল্পসংস্থা সকলেই নগদ সঙ্কটে ভুগছেন। আগামী কয়েক মাস চাষ, ব্যবসা, শিল্প প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজকর্ম বেশ খানিকটা ধাক্কা খেতে পারে। এতে অনেকেই আশঙ্কা করছেন আগামী ত্রৈমাসিকে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কমবে এবং তার ফলে সরকারের রাজস্ব আরও কমবে। এইসব যুক্তিকে ভিত্তি করে সরকার বিরোধী দলগুলি ময়দানে নেমে পড়েছে। জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এরূপ একটি সিদ্ধান্তের ওপর কোনও প্রকার সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বেশ কয়েকটি অবিজেপি শাসিত রাজ্য প্রকল্পটির অসহযোগিতা, সমালোচনা তথা বিরোধিতায় মত্ত হয়ে পড়েছে। কোনও কোনও দল সুযোগ বুঝে বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা চলতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অসাংবিধানিক ও অসংযত বাক্যবাণ প্রয়োগ করা হচ্ছে। কেউ কেউ জনদরদি মনোভাব প্রদর্শন করে এর বিরোধিতা করছেন। আবার মমতা ব্যানার্জীর মতো কতিপয় নেতা এই প্রস্তাব বাতিল বা ৫০০ টাকাকে এই আদেশ থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। বিরোধীদের এই প্রতিবাদের উগ্রতায় সাধারণ জনগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। দেশে মোট নোটের ৮৬ শতাংশ ৫০০ ও ১০০০ টাকা এবং বাকি ১৪ শতাংশ হলো ১০০ এবং তার নীচের টাকা ও মুদ্রাগুলি। এই ১৪ শতাংশ দিয়েই সাধারণত অধিকাংশ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কেনাবেচা হয়ে থাকে। হয়তো কিছুদিন এরূপভাবেই বৃহৎ নোটের বাতিল হওয়া সময়টা অতিবাহিত হতে পারত। কিন্তু বিরোধীদের চিল-চিৎকারে লোকের মনে ভীতির সঞ্চার হয়ে পড়ল। মানুষ নিজের জমানো ছোট নোট বা মুদ্রাগুলি হাতছাড়া করতে অনিচ্ছুক হতে লাগল। ফলস্বরূপ বেড়ে গেল ব্যাঙ্কের সামনে দীর্ঘ লাইন। বিরোধিতার এই ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে আইন ভঙ্গকারীরাও হয়ে পড়ল বেপরোয়া। এক্সিস ব্যাঙ্কের ৩.৫ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ৮ দিনে ২৫.৫৮ কোটি জন-ধন যোজনার অ্যাকাউন্টে জমা পড়া ৬৪২৫০ কোটি টাকার ব্যাপারটাও দুঃসাহসের বটে। যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রতিবাদ করা বিপক্ষ দলের সাংবিধানিক অধিকার। কিন্তু এই অধিকার কিছুতেই দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয়। বর্তমানে সরকারের প্রবর্তিত এই নোট বাতিলের উদ্যোগ ব্যর্থ হলে উগ্রবাদী, দুর্নীতিবাজরা তথা পাকিস্তান উৎসাহিত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিরুদ্ধবাদীরা যুক্তি, কুটুক্তি, অযুক্তি বিভিন্নভাবে সরকারের নোট বাতিলকে প্রত্যাহার করার জন্য পরোক্ষভাবে চাপ দিয়ে আসছে। মানুষের দ্বারা টাকা সংগ্রহের ব্যাপারটিকে উপলক্ষ্য করে তারা সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। জনগণের নাম করে তারা চোখের জলে বন্যার সৃষ্টি করে দিয়েছে। এব্যাপারে সবথেকে বেশি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজে। অথচ এরূপ একটি জাতীয় প্রকল্পে রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল সর্বাগ্রগণ্য। প্রকল্পটিকে বানচাল করার জন্য যে যেভাবে পারছে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতার একটি টেলিভিশন চ্যানেলের একটা সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমান আলোচনাটির ইতি টানছি। খবরে প্রকাশ, মাঠে ধান পেকে গেছে। পাকাধান মাটিতে ঝড়ে পড়ছে। সংবাদদাতার সংযোজন হলো ধান সংগ্রহ সম্পূর্ণ হওয়ার পর মাঠ আলু চাষের উপযোগী করে তুলতে হবে। যদি সময়ে আলু লাগানো সম্পূর্ণ না হয়, তবে এবার পশ্চিমবঙ্গে আলুর দাম হবে কিলোপ্রতি ১০০ টাকা। কিন্তু খুচরো টাকার অভাবে ধান কাটার জন্যে শ্রমিক লাগানো নাকি সম্ভব হচ্ছে না। মনে হলো সংবাদদাতা হয়তো এটা জানেন না যে, পাকাধানের মূল্য টাকার চেয়েও বেশি।

জহরলাল পাল,
লিঙ্ক রোড, শিলচর, অসম

রাজনীতি শয়তানদের শেষ আশ্রয়

অরুণ ঘোড়ুই

বর্তমানে দেশের এবং রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনাবলীর দিকে চোখ রেখে একটা জিনিস আমরা সকলে অনুমান করতে পারছি যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী হতে চলেছেন ভারতের বৃহত্তম রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এক বিশেষ চরিত্র। বিরোধীপক্ষের প্রতিবাদী মুখ হিসেবে তিনিই প্রকটিত হতে চাইছেন ধীরে ধীরে। সরকারের বিভিন্নরকম সিদ্ধান্ত এবং তথাকথিত বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত। তার উপর সম্প্রতি যোগ হয়েছে উচ্চমূল্যের নোট বাতিল, টোলপ্লাজায় সৈন্য-টহল, বিমানবন্দরে বিমান অবতরণে বিভ্রাট ইত্যাদি কয়েকটি ইস্যু। ফলে কেন্দ্রবিরোধী সবরকম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে তাঁকেই। নোট বাতিল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তাঁর দলের এমপিরা যেমন সংসদে ঝড় তুলেছেন, তেমন সংসদের বাইরের ধরনায় বসেছেন। তিনি নিজেও পর পর প্রতিবাদ সভা করে ফেলেছেন। কর্মীদের পাঠিয়ে সভা করেছেন ঝাড়খণ্ড, ওড়িশায়। ফলে ইতিমধ্যে অনেকেই তাঁকে ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভাবতে শুরু করেছেন। ভাবনাটা অন্যায় নয়। রাজনীতি হোল সম্ভাবনার শিল্প।

এখন আমি যে কথা বলতে চাই—রাজনীতিতে আরো কিছু বিষয় থাকে, কিছু নিয়ম-নীতি থাকে যা প্রত্যেকটি রাজনীতিবিদকে মেনে চলতেই হয়। কিছু মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকতেই হয়। তা না হলে রাজনীতি হয়ে দাঁড়াবে এক বিকট প্রহসন। যেমন সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা, সংবিধানে দেওয়া সুযোগ সুবিধাগুলোর অপব্যবহার না করা, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কুৎসা প্রচার থেকে বিরত থাকা, ভুল হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, ঘন ঘন নিজের অবস্থান বদল না করা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রকল্যাণের চিন্তাটিকে অন্তরে জাগিয়ে রাখা। বড় পরিতাপের বিষয় যে আমাদের জননেত্রীর মধ্যে এইসবের অনেক কিছুরই অভাব দেখা যায়। যে কোনও সমালোচনাকে তিনি 'বিরোধীদের ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যা দেন। কারোর গায়ে 'মাওবাদী' তক্মা সেঁটে দেন। রাষ্ট্রের একজন প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের আচরণে এমন ত্রুটি থাকা উচিত নয়, যা একজন সাধারণ নাগরিকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। আমরা সকলেই দেখেছি রাজ্যের বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন তিনি ঘন ঘন 'বনধ্' ডেকেছেন, জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দিনের পর দিন অবস্থান বিক্ষোভ করেছেন, এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 'বনধ্' নিষিদ্ধ করেছেন। কোনও সরকারি কর্মচারী 'বনধ্'-এ শামিল হলে তাঁর বেতন কেটে নিচ্ছেন। যে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছেন এখন সেই সিঁড়িকেই অস্বীকার করছেন। হ্যাঁ, 'বনধ্' অবশ্যই দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কিন্তু এই শুভবোধ সেদিন কেন তাঁর হয়নি তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। তাঁর অনুগামীরা বিধানসভার ভেতরে চেয়ার-টেবিল-মাইক ভেঙে লন্ডভন্ড করেছেন তার জন্য কোনও অনুশোচনা নেই। যে অস্ত্রকে তিনি একসময় বিরোধীদের প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করেছেন, আজ শাসক হয়ে তিনি বিরোধীদের হাত থেকে সেই অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছেন। এটা কী দ্বিচারিতা নয়? পুলিশকে দিয়ে বিরোধীদলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা করাচ্ছেন, নিজের দলের অপরাধীদের জামিন পাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে এমন অপরাধীকে নিয়ে প্রকাশ্যে সভাও করছেন—এটাই কি আইনের শাসন, না নিরপেক্ষতা! আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত মন্ত্রী মদনের মন্ত্রিত্ব বহাল রেখেছেন অনেকদিন, একইভাবে ভোটে পরাজিত হুমায়ুন কবীরের মন্ত্রিত্ব কেড়ে নেননি সঙ্গে সঙ্গে। এসবের নৈতিকতা নিয়ে কোনো আঁচড় নেত্রীর মনকে স্পর্শ করে বলে আমাদের মনে হয় না। ভিন্ন দলের কয়েকজন বিধায়ক সম্প্রতি তাঁর দলে নাম লিখিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের বিধায়ক পদে ইস্তফা দেননি। এই নিয়ে অনেক সমালোচনা হলেও নেত্রী কিন্তু নির্বিকার। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী খুব চোখা চোখা শব্দবন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করছেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, কলকাতা পুরসভাকে আয়কর আদায় সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রকে দিতে বারণ করছেন, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স এড়িয়ে যেতে উপদেশ দিচ্ছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের। এইসব আচরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে মানানসই কিনা সে প্রশ্ন যেমন থাকছে, তেমনি ভয় হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে বুমেরাং হয়ে ফিরবে কিনা নেত্রীর কাছে যখন তিনি রাজনীতির বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশ করবেন।

দেশে এখনও বহু সমস্যা আছে যেমনটি আছে রাজ্যেও। ধর্ষণ আছে, শিশুপাচার আছে, খাগড়াগড় আছে, ডেঙ্গু আছে, আর্থিক অনটন আছে, মুখ্যমন্ত্রীর এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা উচিত। রাজ্যবাসী তাঁর কাছে এও জানতে চায়—'তিন তালাক' নিয়ে তাঁর অবস্থান কী? শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষাব্যবস্থা চান কিনা? সম্প্রদায়ভিত্তিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা কি ঠিক? রাজ্যে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার কথা ভাবছেন কিনা? অনুপ্রবেশ নিয়ে তিনি কী মত পোষণ করেন? পাকিস্তানি গজল গায়ককে কলকাতায় ডেকে এনে তিনি যে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন, তা কি বজায় রাখবেন লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে দেশে ফেরানোর ব্যাপারে?

নেত্রী যত বড় পদের দিকে এগোবেন, এ প্রশ্নগুলি তত বড় হয়ে পেছনে ধাওয়া করবে। তারপরেও যদি সেগুলি উপেক্ষা করা হয় তবে সেই প্রবাদবাক্যটিকে সকলে সত্যি বলে মনে করবে—'রাজনীতি হলো শয়তানদের শেষ আশ্রয়'। ■

মহাভারতের অপ্রধান চরিত্র

কৃতবর্মা

শ্রীদেবপ্রসাদ মজুমদার

মহাভারত যুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী যে দশজন মাত্র জীবিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃতবর্মা একজন। এই বীরপুরুষ পাণ্ডবদের হিতৈষী হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত অভিমানবশত কৌরব পক্ষে যোগদান করে যুদ্ধ করেছিলেন। মহাভারতের আদি পর্বে দেখা যায় যদুবংশীয় হৃদিকের পুত্র ছিলেন কৃতবর্মা। নামের সঙ্গে তাঁর কর্মকাণ্ডেরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মরুদ্‌গণের অংশে এই মহাবীরের জন্ম। সাত্যকির মতো তিনিও শ্রীকৃষ্ণের অনুগত অনুচর ছিলেন। বীরত্বেও তিনি সাত্যকির থেকে কোনও অংশে কম ছিলেন না। তাঁর অস্ত্রগুরুর নাম কী ছিল তা মহাভারতকার ব্যক্ত করেননি। তবে অনুমান করা যায় যে আচার্য দ্রোণই তাঁর গুরু ছিলেন। কারণ মহাভারত ও ভাগবত পাঠে জানা যায় যদুবংশের অনেক বীরই আচার্য দ্রোণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ উৎসবে বলরাম, কৃষ্ণ ও সাত্যকির সঙ্গে এই বীর কৃতবর্মাও উপস্থিত ছিলেন। এরপর কৃতবর্মাকে আমরা লক্ষ্য করি হস্তিনাপুরের রাজসভায়। কুরু পাণ্ডবদের মধ্যে যাতে সন্ধি স্থাপিত হয় সেই উদ্দেশ্যে বাসুদেব কৃষ্ণ দূতরূপে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় উপস্থিত হন। তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন সাত্যকি ও কৃতবর্মা। শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য ব্যর্থ হলে দুর্যোধন কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দি করবার চেষ্টা করেন। সেই ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সাত্যকি কৃতবর্মাকেই বলেছিলেন—শীঘ্র সেনাদল সজ্জিত ও প্রস্তুত করে তিনি যেন সভাদ্বারদেশে উপস্থিত থাকেন।

যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে তখন কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষই নিজ নিজ পক্ষীয় সৈন্যাদি সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছেন। ওই সময় যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে কৃষ্ণ ও যদুবংশীয়দের সাহায্যের জন্য দ্বারকায় অর্জুনকে পাঠালেন। অর্জুনের দ্বারকায় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই দুর্যোধন দ্বারকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণের কাছ থেকে তাঁর বিখ্যাত নারায়ণী সেনা লাভ করবার আশ্বাস পেয়েই কৃতবর্মার কাছে উপস্থিত হন ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এদিকে অর্জুন দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সাহায্যপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও কৃতবর্মার সঙ্গে দেখা করেননি, সম্ভবত এই কারণেই অর্থাৎ অভিমানের বশবর্তী হয়েই কৃতবর্মা দুর্যোধনের পক্ষে নিজে যোগদান করেন ও তাঁর এক অক্ষৌহিণী সেনা দুর্যোধনকে প্রদান করেন। পাণ্ডবদের প্রতি প্রীতিভাজন হওয়া সত্ত্বেও কেন যে কৃতবর্মা কৌরব পক্ষে যোগদান করেছিলেন বা অর্জুন দ্বারকায় উপস্থিত হয়েও কেন যে কৃতবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাহায্যপ্রার্থী হলেন না, সে প্রসঙ্গে মহাভারতকার সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। ফলে কৃতবর্মার কাছ থেকে পাণ্ডবেরা কোনও প্রকার সাহায্যই লাভ করতে পারেননি। কৃতবর্মা এক অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও বীর ছিলেন, তাই তিনি যে অসাধারণ বীর ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়।

কৃতবর্মা কেমন যোদ্ধা ছিলেন সেই বিষয়ে মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে রথাতিরথের গণনা প্রসঙ্গে মহামতি ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলেন---''শ্রেষ্ঠ শস্ত্রবিদ্ কৃতবর্মাকে অতিরথ বলে জানবে। ইনি রণক্ষেত্রে তোমাকে প্রভূত সাহায্য করবেন। ইন্দ্র যেমন দানবকুল ধ্বংস করেন, এই দূরপাতী দৃঢ়ায়ুধ বীরপুরুষও সেইরূপ তোমার শত্রুসৈন্য ধ্বংস করবেন। ভীষ্মের কৃতবর্মা সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি থেকে তাঁর বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর পরবর্তীকালে দুর্যোধন এই বীরকে এক অক্ষৌহিণী সেনার অধ্যক্ষরূপে বরণ করেছিলেন।

এরপর সৌপ্তিক পর্বে আমরা দেখতে পাই আচার্য দ্রোণের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রাগে, দুঃখে প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজ পিতার হত্যার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য গভীর রাত্রিতে পাণ্ডব শিবিরের দিকে যাত্রা করেন। ওই সময় তিনি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেন। অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে কৃতান্ত-সদৃশ হয়ে নির্বিচারে হত্যালীলা সংঘটিত করেন তখন কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা শিবিরের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে প্রাণভয়ে পলয়মান বীর ও সৈন্যদের হত্যা করেছিলেন। এছাড়া অশ্বত্থামাকে খুশি করবার জন্য কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য পাণ্ডব শিবিরের তিন দিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর যুদ্ধশেষে কৃতবর্মা দ্বারকায় ফিরে যান। অশ্বমেধিক পর্বে আবার আমরা কৃতবর্মার দেখা পাই। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছেন এই যদুবীর কৃতবর্মা। যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ স্বীকার করে তিনি যজ্ঞে হস্তিনাপুরে উপস্থিতও হয়েছিলেন এবং যজ্ঞের শেষে শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি যাদবগণের সঙ্গে স্বদেশ দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, তার বিবরণ পাওয়া যায়।

এরপর যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন প্রাপ্তির পঁয়ত্রিশ বছর গত হয়েছে। ব্রহ্মশাপে যদুবংশে পরস্পর হানাহানি শুরু হয়েছে। সুরাপানে মত্ত হয়ে যদুবংশীয়গণ নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেছেন। ওই সময় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উভয় পক্ষের অন্যায় আচরণের উল্লেখ করে সুরাপানে মত্ত সাত্যকি ও কৃতবর্মার মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হঠাৎ সাত্যকি এক সুতীক্ষ্ণ অসির দ্বারা কৃতবর্মার শিরচ্ছেদ করেন, এভাবে এই মহান যদুবীরের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ■

চারণ কবি বসন্ত্ গোবিন্দ্ পোৎদার

অমিত ঘোষদস্তিদার

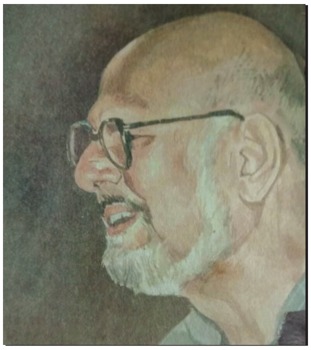

দেশকে ভালোবাসতে পারলে, সত্যিকারের 'কৃতজ্ঞ' হয়ে উঠতে পারলে দেশের কাজ নানাভাবে করা যায়।

বসন্ত্ গোবিন্দ্ পোৎদার তেমনই একজন সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠা ব্যক্তি। ১৯৩৭ সালে মধ্যপ্রদেশের সাগরে 'দেহমন্দির' নামক বাড়িতে তিনি জন্মেছিলেন। মায়ের তাড়নায় কোনোক্রমে বি.এ. পাশ করার পর তাঁর আর পড়াশুনা হয়নি। বসন্ত্ এককভাবে অভিনয়-গান ইত্যাদির মিলিত প্রয়োগে জানান, বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে করে বেড়াতেন। তিনি যে খুব ভালো গায়ক বা গানের বোদ্ধা ছিলেন তা কিন্তু নয়। তবে শুনে এবং দেখে সবকিছু দ্রুত রপ্ত করে নেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল অসীম। কোনও বাজনাদার বা সহশিল্পী ছাড়া একা একাই তিনি দেশে বিদেশে অনুষ্ঠান করে বেড়াতেন।

বসন্ত্ একক অভিনয়ের প্রেরণা পেয়েছিলেন বিখ্যাত মারাঠা নাট্যকার ও অভিনেতা পি এল দেশপাণ্ডের কাছ থেকে। পি এল দেশপাণ্ডে (পুলাদেশপাণ্ডে নামেও তিনি খ্যাত ছিলেন) বসন্ত্‌কে বলেছিলেন, 'তুমি চারণ কবিদের মতন বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কাহিনি মানুষকে শোনাও, গান গেয়ে অথবা গদ্য-গল্পে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে।' সেই প্রেরণাই উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল বসন্ত্‌কে। পরাধীন আমলে যেসব বিপ্লবী দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, যাঁদের কথা এখন অনেকেই মনে রাখেনি, স্বাধীন ভারতের সরকারও তাঁদের সম্পর্কে উদাসীন ছিল, সেইসব বিপ্লবীদের কথা একালের মানুষদের কাছে ঘুরে ঘুরে শোনানোর কাজ দিয়েই বসন্ত্ শুরু করেছিলেন তাঁর ইপ্সিত কাজ। মারাঠিভাষায় স্বরচিত তাঁর প্রথম অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'বন্দে মাতরম্'। গান, আবৃত্তি, নাটক, ভাষ্যপাঠ ইত্যাদি কোনও কিছুই না জানা ছেলেটি নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায় সবকিছু রপ্ত করে নিয়ে মানানসই অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে শুরু করলেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানের সময় ছিল দু'ঘণ্টা। এই দু'ঘণ্টা মঞ্চে তিনি একাই ভাষ্য-গান- আবৃত্তি ইত্যাদি দিয়ে দর্শককে মুগ্ধ করে রাখতেন। মহারাষ্ট্রের পূর্ণমন্ত্রীসভায় তিনি তাঁর অনুষ্ঠান করেছিলেন, স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সামনে। অনুষ্ঠান করেছিলেন জেলখানার কয়েদিদের কাছেও। সারা মহারাষ্ট্র ঘুরে পাঁচ হাজার অনুষ্ঠান করার পর উত্তরভারতে হিন্দিতে অনুষ্ঠান করতে শুরু করেন। যেকোনও ভাষা তিনি তিন থেকে ছ'মাসের মধ্যেই রপ্ত করে নিতে পারতেন। পশ্চিমবঙ্গে গত শতকের সত্তর দশকের গোড়ায় এসেছিলেন। এখানে এসে বাংলা শিখে বাংলাভাষায় নানাস্থানে অনুষ্ঠান করেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর আটটি লেখা প্রকাশ পেয়েছিল।

শিবাজীর জীবন ও কর্ম অবলম্বনে চারণ বসন্ত্ 'শের শিবরাজ' নামে অনুষ্ঠান করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে করেছিলেন 'অগ্নিপুত্র' নামে অনুষ্ঠান। পাহাড়ী স্যান্যাল, ভীষ্মদেব চ্যাটার্জী, আমির খান, কুমার গন্ধর্ব, ভীমসেন যোশীর সঙ্গে জীবনের কোনও না কোনো সময়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে আত্মিকভাবে যুক্ত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— হিন্দি ও মরাঠি ভাষায় অনুষ্ঠান করে জনপ্রিয় হবার পরেও তিনি বাংলা শিখতে কলকাতায় এলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বসন্ত্ বলেছিলেন— 'আমি 'বন্দে মাতরম্' অনুষ্ঠানে যে-সব বিপ্লবীদের কথা বলি, তাঁদের মধ্যে পঁচাত্তর ভাগ বাঙালি। তাই আমি বাঙালিদের ভালো করে জানতে চাই, চিনতে চাই, বাংলার মতন একটা সুন্দর ভাষা শিখতে চাই এবং বাংলায় অনুষ্ঠান করে সেই সব বাঙালি বিপ্লবীদের কিছুটা ঋণ শোধ করতে চাই।'

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী নিয়ে 'যোদ্ধা সন্ন্যাসী' নামের অনুষ্ঠান সারাভারতে এবং বিদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সত্তরের দশকের শেষ থেকে যখন সারা ভারতেই বাংলার অবনতির কথা, বাঙালিদের নানারকম নিন্দে গুঞ্জরিত হচ্ছিল চারিদিকে, তখন মহারাষ্ট্রীয় চারণ বসন্ত্ দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বাংলার গৌরবগাথা, বাংলার সংস্কৃতি ও বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করে বেড়িয়েছেন। বসন্তের ছিল বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি। মঞ্চের ওপর তিনি একা সিংহবিক্রমে ঘোরাফেরা করতেন। একটানা বক্তৃতার মতন নয়, তার মধ্যে থাকত বিভিন্ন সংলাপ, কখনও গান, কখনও হাসি, কখনও কান্না। কোথাও অতিনাটকীয়তা থাকতো না, অথচ সমগ্র অনুষ্ঠান আবেগ ভরপুর হয়ে উঠত। প্রতিটি দু'ঘণ্টার অনুষ্ঠানে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দর্শকদের নিজ নিজ আসনে বসিয়ে রাখার ক্ষমতা তাঁর খুবই সহজাত ছিল।

ভারত বিজয় করে চারণ বসন্ত্ বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। লন্ডন, আমেরিকা-সহ বিদেশের নানা স্থানে তিনি অনুষ্ঠান করতেন। সব স্থানেই তাঁর অনুষ্ঠান খুবই গ্রহণযোগ্য ছিল। বেশ কিছু বইও তিনি লিখেছিলেন। মরাঠিভাষায় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত বই 'নাল'। হিন্দি ভাষায় তিনি পাঁচখানি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'মেরে প্রিয়জন' খুবই উল্লেখযোগ্য বই। যাযাবর জীবনযাপনে অভ্যস্ত বসন্ত্ গোবিন্দ্ পোৎদার মানুষের পরম্পরাগত জীবনধারায় সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠার বীজমন্ত্র দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আমাদের উচিত তাঁর প্রচেষ্টা-পদ্ধতিকে জীবনে এগিয়ে চলার পথে কাজে লাগানো। ■

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

ওয়ার্নার হেইসেন্‌বার্গ : (১৯০১-১৯৭৬)

পরিচিতি : ইনি জার্মানির অন্যতম বৈজ্ঞানিক যিনি ‘কোয়ান্টাম মেকানিক্সের’ সহ-প্রতিষ্ঠাপক। হাইড্রোজেনের ‘অ্যালোট্রপিক’ আকার আবিষ্কার করেন। ১৯৩২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর বিশেষ পরিচিতি হচ্ছে ‘আনসারটেন্টি প্রিন্সিপল্ অফ্ কোয়ান্টাম থিয়োরি’র আবিষ্কারক হিসাবে।

উদ্ধৃতি : কোয়ান্টাম ফিজিক্সের যে সব তত্ত্ব উদ্ভট বলে মনে হতো, ভারতীয় দর্শন আলোচনার পর তা অনেক সহজ বোধ্য এবং অর্থপূর্ণ বলে মনে হতে লাগলো।

উৎস : বেদিক ইকোয়ালিটি অ্যান্ড হিন্দুইজম্ : ও. পি. গুপ্তা।

ফ্রেডেরিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)

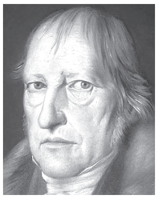

পরিচিতি ঃ ইনি জার্মানির অন্যতম দার্শনিক এবং সাহিত্যিক। তাঁর ইতিহাস ভিত্তিক আদর্শগত বিশ্লেষণ ইউরোপীয় দর্শনে আনে যুগান্তকারী বিপ্লব। তাঁর দর্শন পরবর্তীকালে সরকারি শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক কাঠামো ও ধারণামূলক পরিকল্পনাগুলিকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

উদ্ধৃতি ঃ ভারত হচ্ছে একটা স্বপ্নের দেশ। ভারত সর্বদাই বলে এসেছে-—মানুষের চরম লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষ লাভ। আর এটাই ভারতকে অন্য দেশের তুলনায় এতবেশি সৃজনশীল হতে সাহায্য করেছে। সেইজন্যই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কিংবদন্তী ও পৌরাণিক কথা, সঙ্গীত ও নৃত্য, ধর্ম, দর্শন এবং বিভিন্ন প্রকার স্থাপত্যকর্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে।

উৎস ঃ ‘এ সার্ভে অফ্ হিন্দুইজম’—ক্লউস. কে. ক্লাস্টারমেয়ার।

উদ্ধৃতি ঃ ভারতীয় সাহিত্যের অতুলনীয় ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয়ের শুরুতে, এক মুহূর্তেই সকলে অবাক হয়ে যায় যে, এই দেশের প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক মননশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তি এত ঋদ্ধ এবং তা গভীর চিন্তনের সর্বোচ্চ স্তরের।

উৎস ঃ দ্য ফিলসফি অফ্ হিস্ট্রি – জর্জ উইলহেল্‌ম ফ্রেডরিক হেগেল।

হেনরি ডেভিড থরো (১৮১৭-১৮৬২)

পরিচিতি ঃ ইনি আমেরিকার অন্যতম দার্শনিক, সাহিত্যিক, সমালোচক এবং অতীন্দ্রিয়বাদী লেখক। তাঁর লেখা ‘সিভিল ডিসওবিডিয়েমের’ দর্শন পরবর্তী প্রজন্মের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন লিও টলস্টয়, মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিং-এর রাজনৈতিক চিন্তা এবং কার্যাবলীকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে।

উদ্ধৃতি ঃ প্রাচীন ভারতের ধর্মগ্রন্থগুলিতে মানুষের সম্পর্কে ধারণা সীমাতীত এবং মহিমময়। সেখানে তাঁরা নিজেদের বিলীন করে দেন চরম মহান সত্তার অস্তিত্বের মধ্যে।

উৎস ঃ দ্য রাইটিং অফ্ হেনরি ডেভিড থরো—ওয়াল্ডেন।

উদ্ধৃতি ঃ বেদের একটি বাক্য হচ্ছে ম্যাসাচুয়েট শহরের মূল্যের কয়েকগুণ মহার্ঘ।

উৎস ঃ দ্য জার্নাল অফ্ হেনরি ডেভিড থরো।

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০)

পরিচিতি ঃ ইনি ছিলেন ইংল্যান্ডের অন্যতম কবি, চিন্তাবিদ এবং রোমান্টিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। তিনি ১৮৪৩ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত আমৃত্যু ব্রিটেনের পয়েট লরিয়েট হিসেবে ভূষিত ছিলেন।

উদ্ধৃতি ঃ তারা ছিল এক প্রগাঢ় প্রাণোচ্ছল জাতি; পরিধানে ছিল যাদের সোনালি গঙ্গাফড়িংয়ের চুমকি। যেন তারা ওই উজ্জ্বল জীবগুলির মতো ভূত্থিত, সেই পবিত্র ভূমিতে তার আবির্ভাব হয়েছিল সৃষ্টির অনাদিকালেই। তিষ্ঠ ক্ষণকাল! তার্কিক মনের সঙ্গে অলৌকিক তত্ত্বের বিরোধ? আকাশের ঝরনা হতে, হিন্দুরা এনেছিল পবিত্র গঙ্গা; এনেছিল মানব জাতির পবিত্র জীবন প্রবাহ, দৈবিক শক্তির সিংহাসন হতে; আশা আর বিশ্বাসের পাত্র ভরে।

আমাদের মহান অস্তিত্ব তাকে করেছিল রাজকীয়;

সে ছিল অনন্ত-সূর্যের তলে গঙ্গার মতো, যেন সজীব সাগরের এক অংশ।

যা এতদিন ছিল নাইজার নদীতে নিমজ্জিত, দুর্ভেদ্য বালুরাশির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে;

যদি কেউ ভাবনার মুখোমুখি হও অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও—

উৎস : দ্য কমপ্লিট ওয়ার্কস্ অব উইলিয়ামস ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

খাদির প্রাসঙ্গিকতা ও মহিলারা

সুতপা বসাক ভড়

সুতি কাপড়ের শিল্প পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি শিল্প। ভারতে সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে তুলোর ব্যবহার চলে আসছে। ভারত থেকে তুলোর ব্যবহার শিখে আরবরা তা ইউরোপে নিয়ে যায়। প্রকৃতির প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ এই তুলো। তুলোর তৈরি পোশাক হয় প্রাকৃতিক। দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃতি থেকে তুলো সংগ্রহ করে তা দিয়ে পোশাক বানাবার এবং তা ব্যবহার করার প্রথা আমাদের দেশে চলে আসছে। খাদিশিল্প এমনই একটি শিল্প, যার সঙ্গে আমাদের দেশের স্বাভিমান জড়িয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকল দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, প্রত্যেক ভারতবাসী যেন দৈনন্দিন জীবনে যেকোনো একটি খাদির তৈরি জিনিস ব্যবহার করে। একটি সামান্য খাদির রুমাল ব্যবহারকেও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। এতে আমাদের এই স্বকীয় শিল্পটি অনেকটাই প্রগতি লাভ করেছে (৩৪ শতাংশ) এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। শিশু-বৃদ্ধ, মহিলা-পুরুষ সবার জন্য খাদির পণ্যসম্ভার বাজারে সুলভ। এগুলি ঐতিহ্যানুসারী এবং আধুনিকও বটে। দামও আয়ত্তের মধ্যে। শুধুমাত্র প্রয়োজন এই উৎপাদনের সম্বন্ধে অবগত হয়ে তা ব্যাপকহারে ব্যবহার করা। খাদির ক্যালেন্ডার এবং ডায়েরিতে জনগণের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর চরকা কাটার ছবিটি ভারতবাসীর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

পরম্পরাগতভাবে আমাদের দেশে তুলো থেকে তৈরি পোশাক পরার প্রচলন আছে। পরাধীনতার সময় স্বদেশি আন্দোলনে খাদির পোশাক এবং অন্যান্য সামগ্রী দেশপ্রেমে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। মহাত্মা গান্ধী খাদিকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। খাদির ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দেশের একটি পরম্পরাগত শিল্প নব জন্মলাভ করে।

মূলত কার্পাস গাছ থেকে তুলো পাওয়া যায়। সেই তুলো থেকে সুতো এবং ওই সুতো দিয়ে তাঁতে বোনা কাপড়গুলি খাদির কাপড় বলে পরিচিত হয়। এই ধরনের কাপড় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও বিছানার চাদর, দরজা-জানলার পর্দা, টেবিলক্লথ ইত্যাদি তৈরিতে খাদির অবদান যথেষ্ট। খাদির তৈরি কাপড় ব্যবহারের পক্ষে খুবই আরামদায়ক। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, হালকা শীতে এর থেকে আরামদায়ক পোশাক আর হয় না। পরিবেশে রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে উপযোগী। পুরনো বা ব্যবহারের অযোগ্য হলে তা আবার প্রকৃতিতেই মিশে যায়। অযোগ্য, পুরনো খাদির কাপড় থেকে মেশিনের সহায্যে তুলো বানিয়ে তা দিয়ে সুন্দর বালিশ, পোশাক ইত্যাদি তৈরি করা যায়। সুতরাং ঠিকঠিক ব্যবহার হলে খাদির কিছুই ফেলা যায় না এবং এগুলি প্রকৃতির ওপর কোনোরকম খারাপ প্রভাবও ফেলে না।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে খাদি। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ভগিনী নিবেদিতা, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ মহাপুরুষ খাদিকে তাঁদের জীবনের মুখ্য স্থানে বসিয়েছেন। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র পোশাকের প্রতি অনুরাগ নয়, বরং দেশ ও দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসার নিদর্শন। আমরা ভাগ্যবান যে কার্পাস গাছের জন্য অনুকূল পরিবেশ আমাদের দেশে রয়েছে। সেজন্য আমরা তুলো থেকে খাদির কাপড় তৈরি পর্যন্ত সব ব্যাপারেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রকৃতির এই আশীর্বাদ আমাদের সম্মান জানানো উচিত।

তুলো সংগ্রহ করা, নলি কাটা, তাঁতের কাপড় বোনা—এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলিতে বহু মানুষ বংশ পরম্পরায় কাজ করে চলেছেন। খাদির কাপড় ব্যবহার করলে এই পরম্পরাগত শিল্প এবং শিল্পীরা উৎসাহিত হবেন। ফলস্বরূপ, এই শিল্পটি পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। বর্তমানে বিদেশের বাজারেও খাদির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এই শুভকাজে দায়িত্ব অনেক। আমরা যদি একটু খেয়াল করি, তবে দেখব যে সুমিত্রা মহাজন, সুষমা স্বরাজ, স্মৃতি ইরানি থেকে শুরু করে বিভিন্নক্ষেত্রে অগ্রণী মহিলারা খাদির তৈরি শাড়ি বা অন্যান্য পোশাক ব্যবহার করছেন। এগুলি প্রাচীন এবং আধুনিক জীবনশৈলী উভয়ের পক্ষেই মানানসই। সুতরাং, দৈনন্দিন জীবনে খাদির ব্যাপক ব্যবহার করে মহিলারা এই শিল্পটির প্রচার-প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারি। গৃহস্থলীর জন্য বিছানার চাদর, লেপ, তোশক, দরজা-জানলার পর্দা, টেবিল-ক্লথ, পাপোশ থেকে শুরু করে ধুতি, পাঞ্জাবি, শার্ট, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, রুমাল, গামছা ইত্যাদি আমরা খাদি থেকে কিনতে পারি। এগুলির দামও বেশি নয়। এর ওপর বছরের একটি বিশেষ সময়ে খাদির জিনিসের দামে অনেকটা ছাড় পাওয়া যায়। সারা বছরের প্রয়োজনানুসারে কেনাকাটা সেরে নেওয়া মহিলাদের পক্ষে খুবই সুবিধার। সুতরাং খাদির জিনিস ব্যবহারে সেগুলির দাম, অপ্রতুলতা বা প্রকৃতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারব, বিদেশি কোম্পানির পণ্য না কিনে আমরা যদি খাদির জিনিস কিনি এবং ব্যবহার করি, তা সঞ্চয় এবং শরীর উভয়ের পক্ষেই ভাল। এছাড়া সঙ্গে রইল স্বদেশি ভাবনা। আমাদের অর্থনীতিকে মজবুত করব আমরাই। দেশের টাকা দেশেই থাকবে। সেজন্য ২০১৭-র খাদির ক্যালেন্ডার এবং ডায়েরিতে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অনেকের সঙ্গে বসে চরকা কাটতে দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করার অন্যতম একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত মহিলাদের হাতে আছে এটা ভাবতেও ভাল লাগছে। ■

এবার পরের ধাপ

যে টাকা উদ্ধার হলো তা অর্থনীতির উন্নয়নে সদব্যবহার করা কার দায়িত্ব?

অতিথি কলম

উমা শশীকান্ত

প্রতিনিয়ত যখন ব্যাঙ্কগুলির ভাঁড়ারে নগদ টাকা উপচে পড়তে লাগল, আমরা অবাক হয়ে দেখলাম কী বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ অলসভাবে মানুষের সিন্দুকে নিদ্রিত ছিল। এরই অন্য নাম নগদ অর্থের মজুতদারি বা hoarding। চিরকাল সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব ভাণ্ডারে না থাকায় ঘাটতি বাজেট পেশ করে এসেছে। বরাবরই কী শিক্ষা খাতে, কী জনস্বাস্থ্য খাতে কিংবা পরিচ্ছন্নতা বা জলসম্পদ উন্নয়নে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য। গরিবরা ন্যায্য সুদে ধার পাওয়া থেকে সব সময়ই বঞ্চিত। উৎপাদনে উপযোগী উদ্যোগগুলিতে বিনিয়োগের অভাবে প্রয়োজনীয় চাকুরিও সৃষ্টি হতো না। এরকম একটা পরিস্থিতিতে দেখা গেল কতিপয় লোক কোটি কোটি টাকা, হিসেবহীন অর্থ করব্যবস্থা থেকে লুকিয়ে রেখেছে। নিজেদের গোপন কুঠরিতে তা গুদামজাত।

যে-কোনো অর্থনীতিকেই এগিয়ে যেতে হলে দরকার দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে এমন অর্থনৈতিক উদ্যোগের। যে সমস্ত উদ্যোগপতি উৎপাদনের উপযোগী সরঞ্জামগুলি (factors of production)—যেমন কাঁচামাল, শ্রমিক, আনুষঙ্গিক উৎপাদন উপযোগী নগদ অর্থ লাগিয়ে যে বস্তু তৈরি করেন তার দাম সব খরচ মিলিয়ে বেশি হয় আর এই উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি হয়ে অর্থ চক্র (Money cycle) আবর্তিত হতে থাকে। এই উদ্যোগপতিরাই অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এমনকী একজন ছোট ব্যবসায়ী যে উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশি মূল্যে কোন কিছু বিক্রি করছে সেও অর্থনীতিতে মূল্য যোগ করছে (value addition)। কেননা না সে চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্য রক্ষা করছে। এই বর্ধিত মূল্য যোগ করার প্রক্রিয়ায় যখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয় তখনই মানুষের চাকরি হয়। সে যথোপযুক্ত বেতন পায় আর এই বেতনই কর্মচারীর ক্ষেত্রে তার অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা রক্ষার ও বাজার চালু রাখার নিয়ামক। অর্থনীতির বুনিয়াদী নিয়ম অনুযায়ী উৎপাদনের উপকরণের জমি, শ্রম, সংগঠন, মূলধনগুলির চাহিদা যথা ভাড়া, মজুরি, অন্যান্য খরচ মিলিয়ে যে বাড়তি টাকা থাকে তা দিয়ে যে টাকা লগ্নি করেছে তাঁর সুদ মিলিয়ে লাভ থেকে সরকারের ঘরে কর দিতে হয়। যেটুকু পড়ে থাকে সেটিই উদ্যোগপতির লাভ। কয়েক মাসে যে হিমালয় সদৃশ অর্থ দেশের ব্যাঙ্কগুলির ঘরে ঢুকল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল আমাদের দেশের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার এই বুনিয়াদী ধাঁচা থেকে কতটাই না বিকৃত। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৃহৎ অংশই আবর্তিত হয়েছে স্বল্পসংখ্যক একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মুনাফা পুঞ্জীভূত করার অপচেষ্টায়। হিসেবহীন টাকা তাদের হাতে স্তূপীকৃত হয়েছিল। এই গুদামজাত টাকা কেবল ভূসম্পত্তি, সোনা, শেয়ার ইত্যাদি কেনার কাজে নিয়োজিত হোত নয়তো শুধুই পড়ে থাকত। হঠাৎ বিপুল পরিমাণ কালোটাকা রূপান্তর ঘটিয়ে রাতারাতি কিলো কিলো সোনা কেনার অর্থ শুধুই নিজের জন্য বেআইনি অলস সম্পদ সৃষ্টি করা যে জায়গায় সেই অর্থ দেশের উৎপানশীল কোনো প্রক্রিয়ায় অবশ্যই নিয়োজিত হতে পারত।

বাজারে জমি বাড়ির দাম কেন আকাশ ছোঁয়া থাকত? এর একটাই কারণ এই দাম নিয়ন্ত্রিত হতো সমান্তরাল নগদকেন্দ্রিক অর্থনীতির মধ্য দিয়ে। বাড়িঘরের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে দেশব্যাপী প্রাকৃতিক সম্পদ—যেমন চাষযোগ্য জমি তার চরিত্র হারিয়ে ফেলত। চতুর্দিকের জলাভূমি ও সবুজ নির্বিচারে ভরাট করে বাস্তু জমিতে বদলে যেত।

> “যে তীব্র তাড়নায় সরকার বিমুদ্রাকরণ করেছে পরবর্তী ধাপটিতে যদি সেই তীব্রতায় না ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাহলে কিন্তু ভারতবিখ্যাত সেই ‘জুগাড়’ (Juggad) ওয়ালারা যেনতেন প্রকারেণ যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতে লিপ্ত হতে পারে যাতে কয়েক মাসের এত বড় ত্যাগ নিস্ফলা হয়ে যায়।”

সেই সঙ্গে কালো ধনীদের উপযোগী বিলাসবহুল আরামগৃহ নির্মাণে বিনিয়োগ বেড়েই চলেছিল। এর কারণ পরিণতি এমনটাই হয়েছিল যে নিত্যনতুন গৃহসম্পত্তি বাড়িয়ে চলার আগ্রহে বহু ক্রেতা তাদের সৎভাবে উপার্জন করা ব্যাঙ্কে রাখা টাকা ফ্লাট বাবদ নগদে নেওয়ার অংশ মেটাতে ঢেলে দিত। এইভাবে সাদা টাকা কালো হয়ে যেতে লাগল।

বিনিয়োগকারীরা নগদ-টাকার কারবারিদের এইভাবে সম্পত্তি কেনবার চাহিদার দাপট দেখে এর সম্ভাব্য বিপদগুলির কথা ভাবেইনি। প্রকৃত বসবাসকারী ক্রেতারা এই সম্পত্তি কিনে ফেলে রেখে ভবিষ্যতে দ্বিগুণ বেশি দামে (কারণ চাহিদা তো বেড়েই চলেছে) বিক্রি করার বাড়ি মজুতদারদের কাছে দাঁড়াতেই পারত না। সম্পত্তি চলে যাচ্ছিল তাঁদের নাগালের বাইরে।

অন্যদিকে, আবার বহু কারবারি ও নগদ টাকার মালিকরা ভিন দেশে যেখানে করছুট রয়েছে সেখানে আকর্ষণীয় সব জায়াগার বাড়ি কিনে রাখা ছিল। কেউ কেউ আবার টাকাকে এক পাক বাইরের দেশে থেকে ঘুরিয়ে এনে ভারতের শেয়ার বাজারে লগ্নী করে নগদ টাকার পাশবিক শক্তিবলে শেয়ারের দাম আকাশছোঁয়া করে দিত। এইভাবে কৃত্রিম বৃদ্ধির ফলে প্রকৃত সম্পদমূল্য যে কত হতে পারে তার সবটা এখনও জানা যায়নি। এতবড় মূলধন যা দিয়ে বিপুল সম্ভাবনায় প্রচুর অর্থনৈতিক উদ্যোগ শুরু করা যেত। কিন্তু তার জায়গায় কেবল নিকম্মা কতগুলি বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন মূল্যের কিছু সম্পদ তৈরি হল। যেগুলি অর্থনীতিতে কোনো value addition তো ঘটালই না উল্টে চরম বিকৃতির দিকে নিয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে বড় অঙ্কের টাকা এখন ব্যাঙ্কে এল তা দিয়ে কি এই বিচ্যুতিকে সংশোধন করা যাবে?

কেবলমাত্র বড় ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলি ও সরকার নিজে পারে মূলধনকে সঠিক দিশায় এবং এমন একটা মাত্রায় (Quantity) নিয়োজিত করতে যার ফলে নাগরিকরা উপকৃত হতে পারে। কিন্তু কারবারি উদ্যোগ ও পরিকল্পনা রাতারাতি বদলে ফেলা যায় না। বিগত ২৫ বছরের বড় পুজির সাফল্যগুলির পর্যালোচনা করে দেখা গেছে একচেটিয়া পুঁজির (Crony Capitalism পুঁজিপতিরা আপসেই নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনা ঠিক করে নেয়) আধিপত্য। বহু ব্যবসায়িক উদ্যোগই দেখা গেছে— আসলে সুযোগ সন্ধানী হিসেবে তৈরি হয়েছিল এর পেছনে কোন উদ্ভাবনী শক্তি ছিল না, ছিল না কোনো মেধা। ছিল অনুগতকে অন্যায়ভাবে কিছু পাইয়ে দেওয়ার মনোবৃত্তি। আজকের পরিস্থিতিতে ভারত পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে এই ধরনের নীতিগত বিচ্যুতিগুলি অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে নিতে হবে। এখন প্রয়োজন কিছু করে দেখানোর মত বিশাল বড় ধরনের উদ্যোগের (Large scale interpreneurship) উত্থান যাতে মানুষ ব্যবসায়িক উদ্যোগের ওপর আস্থা ফিরে পায়। এর সফল রূপায়ণে নীতি আদর্শভিত্তিক (good business ethics) পরিচালিত ছোট ছোট কারবারি উদ্যোগগুলি যারা এই সাম্প্রতিক কালে কাজ শুরু করেছে তারা যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাবে।

যতক্ষণ না বড় ধরনের বেসরকারি উদ্যোগ শুরু হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু সরকারকেই সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। দেশের টাকা অর্থনীতিতে ফেরানোর উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই সম্পদকে কীভাবে লাভজনকভাবে নিয়োজিত করা যাবে সে বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাণশিল্প যেখানে শ্রম বিনিয়োগের সম্ভবনা বিপুল, পরিকাঠামো উন্নয়নে হাত লাগালে তার সঙ্গে বেড়ে ওঠে আরও নানান সহযোগী ব্যবসায়িক উদ্যোগ। তেমনি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনকল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে আসন্ন বাজেটে বিশেষ মনোনিবেশ দরকার তার বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজ একথা স্বীকারে লজ্জা নেই যে আমাদের দেশে প্রশাসনের বুনিয়াদী ধাঁচায় ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের ওপর জনগণের আস্থা ক্রম-অধোগামী। যতদিন পর্যন্ত রাজনীতিবিদরা নির্বাচন লড়ার জন্য কারবারিদের থেকে টাকা নেবে ততদিন তারা তাদের সুবিধে নিতে সরকারি শুভ উদ্যোগগুলিতে তাঁদের (কারবারিদের) অন্যায্য লাভ করার অবাঞ্ছিত সুবিধে দেবেই। এই সূত্রে আইনের প্রয়োগকারী, ট্যাক্স আধিকারিক, স্থানীয় প্রশাসন কেউই শ্রদ্ধা উদ্রেককারী বিশেষ ভূমিকা নেন না। তুলনায় ন্যায়বিভাগ ও মিডিয়ার আংশিক সদর্থক ভূমিকা দেখা গেছে। আমাদের এত বড় ও বৈচিত্র্যময় এক দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করা বাস্তবিকই এক চ্যালেঞ্জ।

তাই আবার বলছি, সরকারের অর্জিত সম্পদকে পুনর্বার নিয়োজনের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যময় ও সমস্যাসঙ্কুল। কর্মনাশা অলস টাকাকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে তা দিয়ে সম্ভবনাময় বাণিজ্যিক উদ্যোগ তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার সঙ্গে বিশাল জনসংখ্যার হিতকারী প্রয়াস নেওয়া ছাড়া সরকারের হাতে কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। সরকার বিমুদ্রাকরণের মাধ্যমে যে ধ্বংসাত্মক শক্তিকে বন্ধনমুক্ত করেছে সেই শক্তি কায়েমি স্বার্থকে চুরমার করে দিয়েছে। যে তীব্র তাড়নায় সরকার বিমুদ্রাকরণ করেছে পরবর্তী ধাপটিতে যদি সেই তীব্রতায় না ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাহলে কিন্তু ভারতবিখ্যাত সেই 'জুগাড়' (Juggad) ওয়ালারা যেনতেন প্রকারেণ যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাতে লিপ্ত হতে পারে যাতে কয়েক মাসের এত বড় ত্যাগ নিস্ফলা হয়ে যায়।

(লেখিকা সেন্টার ফর ইনভেস্টমেন্ট এডুকেশন অ্যান্ড লার্নিং-এর চেয়ারপার্সন)

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

অর্থনীতির দিক থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট একটা চাঞ্চল্যকর রায়ে সিঙ্গুরের ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জীর দাবি গ্রাহ্য করায় রাজ্যবাসী অপার আনন্দ পেয়েছেন। ব্যক্তিগত কারণেও তাদের আনন্দটা হয়েছে বেশি। সিঙ্গুর নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের সময় আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অন্তত পনেরো-যোলটা নিবন্ধের মাধ্যমে জানিয়েছিলাম যে, তৎকালীন বঙ্গ-শাসকদের যুক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি ভ্রান্ত, বিভ্রান্তিমূলক, হঠকারিতাপূর্ণ, ও ক্ষতিকারক। চুক্তির বদলে তাঁরা বন্ধকের ওপরেই ভরসা করেছিলেন। তার ফলে এক মারাত্মক ভ্রান্তির দায়ে তাঁরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম তাঁদের অতলে ডুবিয়েছে।

অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট আইনগত দিকটিই দেখেছে। অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে তখন আমরা দেখিয়েছিলাম তৎকালীন রাজ্য শাসকদের ভ্রান্ত ধারণা ও শিক্ষার দিকটা। তাই আজ মনে হচ্ছে সিঙ্গুর এই দেশের উন্নয়নের ঐতিহাসিক একটা মহামূল্যবান ও চিরন্তন শিক্ষার বিষয় হয়ে থাকবে।

প্রথমত, স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে আমাদের পড়তে হোত রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রকাশিত একটা গ্রন্থ। তার নাম প্রসেসেস অ্যান্ড প্রবলেমস্ অব ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট্ অব আন্ডার ডেভেলাপড্ কান্ট্রিজ। তাতে ছিল উন্নয়নশীল দেশের সামনে শিল্পোন্নয়ন ছাড়া কোনও পথ নেই। কিন্তু যেহেতু এই সব দেশ কৃষিভিত্তিক, সেই কারণেই তাদের সামনে দুটো বিকল্প পথ আছে—(১) আগে কৃষিবিপ্লব সাঙ্গ করে শিল্পায়নের দিকে যাওয়া, অথবা (২) দুটোকে একসঙ্গে ধরে দ্রুত গতিতে কৃষি সমস্যার সমাধান করে তারপর শিল্পায়নের দায়িত্ব নেওয়া। প্রশ্ন উঠবে, আমরা কোন্‌টা করেছি? তৎকালীন রাজ্য সরকার কোনওটা না করেই হঠাৎ টাটা-সালেমদের ডেকে রাতারাতি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে শিল্প 'হাব্' বানাতে চেষ্টা করেছেন। এই ভ্রান্তির দাম তাঁদের দিতে হয়েছে এক মহাবিপর্যয়ের মধ্যে।

তাঁদের ঘোষণা ছিল এই রাজ্যে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে, এবার ঝুঁকতে হবে শিল্পের দিকে। কিন্তু ডঃ বিবেক দেবরায় দেখিয়েছেন যে, দাবিটা ভ্রান্ত—ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-উন্নয়ন হয়েছে স্বল্পই। এই ধরনের রাজ্যে শিল্পের কাঁচামাল ও মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস হলো কৃষি। কৃষিই হলো সেই কারণে শিল্পায়নের ভিত্তি। তাই এটাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে (অধ্যাপক অনিল কুমার বসাক-অপূতরঞ্জন চক্রবর্তী—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, পৃঃ ৬৪)।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে। আমাদের দেশে অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কৃষিতেই সবচেয়ে মন্থরগতিতে উন্নয়ন হয়েছে। অবশ্যই পঞ্জাব, হরিয়ানার মতো অন্যান্য অঞ্চলে আমরা তেমন সাফল্য পাইনি। এমন কি 'সবুজ বিপ্লব'ও সর্বত্র সমান সফল হয়নি। (ডঃ গৌতম কুমার সরকার—ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পৃঃ ১৯১)। এই রাজ্যও এক্ষেত্রে তেমন কিছু করতে পারেনি। তাছাড়া প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্ত মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, একর প্রতি উৎপাদনে এশিয়ায় একেবারে প্রথম স্থানে আছে তাইওয়ান। জমিতে সারের ব্যবহার সেখানে অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে। কৃষকদের মধ্যে স্বাক্ষরতা এনে এবং কৃষির সঙ্গে শিল্পকে যুক্ত করেও সেই দেশ অসাধ্যসাধন করেছে (প্রগতির পথ, পৃঃ ১৩)। আমরা পিছিয়ে আছি এই সব বিষয়ে। আর এক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত জানিয়েছেন, যদি একই জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে দুই বা ততোধিক ফসল ফলানো যায়, তাহলে সেখানে উৎপাদন বাড়ে, কর্মসংস্থানও হয়। সেইজন্য দরকার জমিকে আরও কৃষিযোগ্য করে তোলা (ভারতের আর্থিক উন্নয়ন, পৃঃ ২৬)। কিন্তু রাজ্যে শাসকরা এই সব কথা না ভেবে কৃষিজমিকেই শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। এটা সত্যিই ছিল আত্মহননের পথ।

সিঙ্গুরে ৯৯৭ একর জমি দেওয়া হয়েছিল টাটাদের অথচ ওই জমিতে আলুর বিপুল চাষ হয়। নন্দীগ্রামে ৬৫০০০ একর জমি সালেমের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল কিন্তু সেখানে কৃষির প্রচুর উন্নয়ন ঘটানো যেত।

সুতরাং দ্বিতীয় বিষয়টা বুঝতে হবে। শিল্পের জমি আলাদা--- হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, বিশেষ করে, পুরুলিয়ায় প্রচুর অনুর্বর জমি রয়েছে, শিল্পের জন্য বেছে নেওয়া যেত সেই জমি। দুর্গাপুরে ডাঃ বিধান রায় শিল্পনগরী গড়েছেন। তিনি কিন্তু অফিসারদের আগেই বলেছিলেন, একটুও কৃষিজমি যাতে নষ্ট করা না হয়। আমাদের মার্কসবাদী কর্ণধাররা এই কথা জানতেন না? এই জমির জন্য গুলি চালাতে হলো কেন? কেনই বা তাপসী মালিক, রাধারানিদের ধর্ষণ বা হত্যা করা হল? কেন পুশিলের বেশে টেরিকাটা চটিপরা ঘাতকদের সঙ্গে পাঠাতে হল? অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'চিন্তার মুক্তি' গ্রন্থে লিখেছেন—কৃষিতে লাভ না হলে কৃষক নিজেই জমি বিক্রি করে দেন (পৃঃ ২৫২)। এক্ষেত্রে জমি কেড়ে নিতে হবে কেন পুলিশের সাহায্যে? হুগলীতে 'জেনাইটিস' ৩০০ একর জমি কিনেছে মোটর গাড়ি তৈরির জন্য। সেখানে তো নারকীয় রক্তপাত ঘটাতে হয়নি। তাছাড়া, হিন্দমোটর মাত্র ৩০০ একর জমিতে গাড়ি তৈরি করছে। টাটার ৯৯৭ একর জমি লাগবে কেন? আর কর্তাব্যক্তিরা বলেছিলেন তাহলে শিল্প কি আকাশে হবে?

এক্ষেত্রে পাল্টা প্রশ্ন করি, কৃষি তাহলে হবে আকাশে? দুটোই দরকার—কিন্তু তার জন্য জমির গুণগত ও স্থানগত তারতম্য থাকে।

তৃতীয়ত, এই নেতারা তারস্বরে দাবি করেছিলেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে শিল্প হলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। অবশ্যই সেটা হয়। শিল্পনগরী গড়ে উঠলে লোক নিয়োগ হয়, দোকানপাট-সহ বহু ধরনের কর্মসংস্থান ঘটে। কিন্তু এই সব নেতারা জানেন না যে, বৃহৎ

মোটর শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। লোক নিয়োগ বেশি হয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পে। ধীরেশ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'employment per unit or capital invested is higher in such industries (ইন্ডিয়া ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স, পৃঃ ১৮৭)। এই কারণে বলা যায় অন্যত্র অনুর্বর ও বন্ধ্যা জমিতে যদি ছোট–মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা যেত, তাহলে কর্মসংস্থান হোত অনেক বেশি। বিশেষ করে, বন্ধ চা বাগানের জমিকেও কাজে লাগানো যেত।

মমতা ব্যানার্জীরা টাটা-সালেমের শত্রু নন। তাঁরা এবার গোয়ালতোড়েতে তাঁদেরও ডেকেছেন। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, বাজার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিলে সেখানে শিল্প-নগরী গড়ে উঠতে পারে।

চতুর্থত, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বগনার মার্ক্স লিখেছেন, একটা জায়গায় বেশ কিছু শিল্প গড়ে উঠলে তাদের সকলের সুবিধে হয়—এই 'balanced growth'-ই ছিল দরকার। অনুর্বর জমির কাছাকাছি স্টীল, অভ্র, কয়লা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি থাকলে সেই অঞ্চলটি শিল্পনগরী হয়ে উঠতে পারে। তাতেই আঞ্চলিক সমতা ইত্যাদিও হয় (অলক ঘোষ—এন.সি. সাহা ইকনমিক্স অফ প্ল্যানিং, পৃঃ ১৬২)।

এই সব কথা আমাদের মহান নেতারা জানতেন?

পঞ্চমত, তাঁরা এটাও বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁরা অনন্য শিল্পানুরাগী। কিন্তু তাহলে বাম আমলে এই রাজ্যে পঞ্চান্ন হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেল কেন? তাদের ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া যেত। কালির ব্যবহার কমেছে যখন, ডট্‌পেন্ তৈরির সুযোগ দেওয়া যেত, চটের বদলে প্লাস্টিকদ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া যেত। কিন্তু কারখানা বন্ধ করে 'শপিং মল্' ও হাউসিং কমপ্লেক্স করা হলো দিকে দিকে। শ্রমিক হয়ে গেলেন ফেরিওয়ালা দোকানদার। ফুটপাথ দখল হয়ে গেল পসরার স্তূপে। এক টাটা বা এক সালেম রক্ষা করবে এই রাজ্যকে?

বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইন্স্ মন্তব্য করেছেন, উন্নয়নের সময় অর্থের জোগান বাড়ানোর সঙ্গে তাল রেখে খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনও বাড়াতে হয় তা না হলে দেখা দেবে ভয়ঙ্কর মুদ্রাস্ফীতি। সেই কারণে সারা রাজ্যের ও দেশের কৃষিজমিকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দিতে হবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। আবার তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মাঝারি ও ভারী শিল্পকেও গড়ে তুলতে হবে অ-কৃষিক্ষেত্রে। কৃষিতে রয়েছে ছদ্ম বেকারত্ব (disguised umemployment)। তাঁদের সরিয়ে শিল্পক্ষেত্রে নিতে হবে। একটা সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম নয়, সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব ও শিল্পায়ন ঘটাতে হবে। দুটোকে যুক্ত করার জন্য তৈরি করতে হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা। আর চাই জন-সম্মতি। সব কিছুর সমন্বয় ঘটলে তবেই তৈরি হবে উন্নয়নের প্রকৃত ভিত্তি।

আরেকটা কথা। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কারখানা তৈরির কাজ শেষ হলে কিছু শ্রমিক বেকার হবেন। এই জন্য অর্থনীতিবিদ হিক্স জননিয়োগকে 'revolving (অস্থায়ী) sadimantarm' (স্থায়ী) এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এককভাবে ছকটা তৈরি করতে হবে যাতে কিছুদিন কাজ করার পর বেকার শ্রমিককে অন্যত্র নিযুক্ত করা যায়। এগুলো বাক্যবাগীশ নেতার কাজ নয়-এর জন্য দরকার অর্থনীতিজ্ঞ দেশনায়কের।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা বলি। আমরা পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করলেও 'মিশ্র' অর্থনীতির পথ নিয়েছি। ধীরেন ভট্টাচার্য লিখেছেন, এই ধরনের অর্থনীতিতে দেশে 'পাব্লিক সেক্টার (অর্থাৎ সরকারি ক্ষেত্র) ক্রমে সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু এই রাজ্যে সেটা হল না কেন? কৃষিতে আরও বেশি সমবায় (co-operative) গড়া যেত, সরকার শিল্প গড়তে পারত,বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে 'joint sector' তৈরি করতে পারত।

শুধু দলতন্ত্র করলে এগুলো করবে কে?

পরিশেষে একটা সার সত্যের অবতারণা দরকার। উন্নয়ন করতে গেলে শুধু ইচ্ছে বা উদ্দেশ্য থাকলেই চলবে না। তার জন্য দরকার নিষ্ঠা, সঙ্কল্প ও ত্যাগব্রত। আর সেই সঙ্গে চাই অর্থনীতি, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জ্ঞান ও ধারণা। প্রাচীন গ্রীসের স্মরণীয় মনীষী অ্যারিষ্টটল্ তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে লিখেছেন, শাসক ও জনপ্রতিনিধিদের উচিত এইসব বিষয় নিয়ে নিরন্তর জ্ঞান আহরণ করা যাতে তাঁরা দেশের মানুষকে পথনির্দেশ দিতে পারেন। তার ফলে তাঁরা অবশ্যই বাড়ির প্রয়োজনীয় কাজ করার সুযোগ ও সময় পাবেন না—সেই সব কাজে করে দেবে দাসরা। আমরা অবশ্যই দাস প্রথার ঘোর বিরোধী। এটা সভ্য জগতে কিছুতেই চলতে পারে না। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্যটা বুঝতে হবে। তিনি চেয়েছেন রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধি ও ব্যক্তির কল্যাণ। সেক্ষেত্রে অবশ্যই দকার শাসক ও জনপ্রতিনিধিদের মানসিক উৎকর্ষ।

সুতরাং পকেট নয়, প্রাপ্তির ভাগ-বাটোয়ারা নয়, দরকার কাজ। ক্ষমতায় আসা উচিত সুবিজ্ঞ, ত্যাগব্রতী ও বিবেকবান জনপ্রতিনিধিদের।

অ্যারিস্টটলের গুরু প্লেটোর বক্তব্য ছিল—ক্ষমতায় যাঁরা বসবেন তাঁদের ব্যক্তিগত পরিবার ও সম্পত্তি থাকবে না, তারা হবেন philosopher–King। সেক্ষেত্রে স্বজন-পোষণ, পক্ষপাতিত্ব, সাংসারিক লোভ-লালসার সুযোগ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু এতটা অ্যারিস্টটল চাননি, আমরাও চাই না। নিজস্ব সংসার ও সম্পত্তি শাসক ও নেতা-নেত্রীর থাকতেই পারে কিন্তু সুশাসনের জন্য তাঁদের আদর্শবাদী, বিবেকবান, ত্যাগী ও উচ্চশিক্ষিত হতেই হবে।

আমরা মনে করি, তাঁদের কুম্‌পিটার, লর্ড কেইন্স, মার্ক্স, বলিন্ ক্লার্ক, মরিস্ ডক, বেকভ, বমল্ জোয়ান্ রবিন্সন, রস্টো, লিবেনস্টাইন প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌দের লেখার সঙ্গে পরিচয় থাকতেই হবে। আমাদের দেশের ডঃ সেনয়, ডাঃ ভি. কে. আর. রাও, অম্লান দত্ত, ডঃ ভবতোষ দত্ত, রাখাল দত্ত, ধীরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ আচার্য্যদের গ্রন্থ থেকেও নিতে হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

একবার বামফ্রন্টের এক অর্থমন্ত্রী বেকারভাতা চালু করেছিলেন। কিছু বেকারকে তিন বছর মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী কালে তাঁরা চাকরি পেয়েছেন কিনা জানি না। কিন্তু কোষাগার থেকে এত টাকা যদি কিছু ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করা হোত, তাহলে উৎপাদন বাড়ত, কর্মসংস্থানও হোত। এই সব ভ্রান্ত, ভোটভিত্তিক লোক দেখানো কারসাজি নয়—দরকার সুষ্ঠু, সুচিন্তিত ও গঠনমূলক পরিকল্পনা ও তার নিপুণ রূপায়ণ॥

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক)

তালিবানিকরণের দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। কোন পথে চলেছে বাংলাদেশ? উন্নয়নে দেশ ভাসছে, এরকমই প্রচার সরকারের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ ঘোষণা করে জঙ্গি নির্মূল অভিযানে সফল, একাত্তরের ধর্মান্ধ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অনমনীয়। প্রশংসা কুড়োচ্ছেন দেশে-বিদেশে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে হঠাৎ আপোশ করলেন কেন উগ্র মৌলবাদীদের সঙ্গে? যার অবস্থান জঙ্গিবাদ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীতে। বিশিষ্টজনেরা আঁতকে উঠে শঙ্কা ব্যক্ত করেছেন, এ যে পরিকল্পিতভাবে একটি ইসলামি জাতিরাষ্ট্র গঠনের দিকে যাত্রা। এটা নির্ঘাত ভোটের রাজনীতি।

নতুন বছরে প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছেছে। হঠাৎ চমকে উঠেছেন দেশের মানুষ— কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম, চরমোনাইর পির এবং ইসলামি ঐক্যজোট-সহ ইসলামি সংগঠনগুলো শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনার জন্যে। হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে যারা রয়েছেন, সবাই একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছেন, স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন। চর মোলাইর পির বাংলাদেশের স্বাধীনতায় কখনো বিশ্বাস করেনি। ইসলামি ঐক্যজোটের নেতারা নিজেদের তালিবান বলে দাবি করেন, বাংলাদেশকে তালিবানি রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রকাশ্য ঘোষণা করেছেন। এরা সবাই আওয়ামি লিগ বিরোধী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডে উল্লাস করেছিল। আওয়ামি লিগ সরকার উৎখাতে তাদের চেষ্টা নিরলস। তাদের বড় ক্ষোভ, শেখ মুজিব ও আওয়ামি লিগ সাধের পাকিস্তান ভেঙেছে ভারতের সহযোগিতায়। হেফাজত তো আওয়ামি সরকার উৎখাতে ঢাকা ঘেরাও করেছিল দু’বছর আগে। এর মধ্যে এমন কী ঘটলো যে এই বাংলাদেশবিরোধী উগ্র ধর্মান্ধরা হাসিনার প্রতি আবেগাপ্লুত অভিনন্দন জানালেন?

বাংলা পাঠ্যবইয়ে কাদের লেখা অন্তর্ভুক্ত হবে, কাদের লেখা বাদ দিতে হবে এই দাবি জানিয়ে গত বছরের মাঝামাঝি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছিল হেফাজতে ইসলাম। ২৯টি বিষয় সংযোজন ও

বিয়োজনের কথা বলা হয় তাদের স্মারকলিপিতে। দাবির মধ্যে ছিল— হিন্দু কবি, সাহিত্যিকের লেখা কমিয়ে আনতে হবে কিংবা বাদ দিতে হবে; মুসলমানদের লেখা ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের লেখা যেন বেশি না যায়, তার রাশ টানতে হবে, বাদ দিতে হবে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখের লেখা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হেফাজতের আদেশ শিরোধার্য করে। জানা গেছে, হেফাজত দাবি করেছিল, গত কয়েক বছর ধরে চলে আসা অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবই থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘রামায়ণ কাহিনী’ এবং সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘লালু’ গল্প বাদ দিতে হবে। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলাবই অনেকখানি ছাপা হওয়ার পর দেখা যায় ‘রামায়ণ কাহিনি’ এবং ‘লালু’ বইয়ে রয়ে গেছে। সরকারি নির্দেশে তড়িঘড়ি ছাপা বন্ধ করে ওই লেখা বাদ দিয়ে নতুন করে বই ছাপা হয়েছে। এর মধ্যে ছাপা হয়েছিল প্রায় ১৫ লাখ বই। হেফাজতের দাবি মানতে গিয়ে সরকারকে ৪ কোটি টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। হেফাজত তাদের দাবিতে বলেছিল, পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুত্ববাদ ও নাস্তিক্যবাদ শেখানো হচ্ছে। মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হচ্ছে গোরুকে মায়ের সমান ভক্তি করবে, পাঁঠা বলির নিয়মকানুন, হিন্দু বীরদের কাহিনি, দেবদেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা এবং হিন্দুদের তীর্থস্থান। হেফাজতের দাবি অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে বাদ দেয়া হয়েছে মঙ্গলকাব্যের ‘আমার সন্তান’, ভ্রমণকাহিনি ‘পালামৌ’, বাউলের ওপর লেখা ‘সময় গেলে সাধন হবে না’, কবিতা ‘সাঁকোটা দুলছে’ এবং ‘সুখের লাগিয়া’। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বাদ গেছে ‘রাঁচি ভ্রমণ’, ‘বাংলাদেশের হৃদয়’ এবং ‘লাল গরুটা’। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ‘বাংলাদেশের হৃদয়’ কবিতা নিয়ে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। এই কবিতার সপ্তম লাইনের পর ছিল, ‘তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে’ লাইনটি। গত বছরের বইয়ে এই লাইনটি বাদ দেয়া হয় মন্দির শব্দের কারণে। কিন্তু হেফাজত তাতেও রাজি নয়। এবার রবীন্দ্রনাথের পুরো কবিতাই বাদ দেওয়া হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে হজরত মুহম্মদ, হজরত উমর, হজরত আবুবকর সম্পর্কে বেশ কয়েকটি লেখা যুক্ত হয়েছে হেফাজতের চাহিদা অনুযায়ী। এমনকী মুসলিম কবিরাও ছাড় পাননি। গোলাম মোস্তাফার ‘প্রার্থনা’ কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ‘প্রার্থনা’ শব্দের কারণে। প্রার্থনা হিন্দু (সংস্কৃত) শব্দ। হেফাজতের দাবি অনুযায়ী ইসলামের ওপর ১৭টি লেখা

যুক্ত করা হয়েছে। ১২টি লেখা বাদ দেয়া হয়েছে। ন'জন হিন্দু লেখকের লেখা বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব দাবি করেছিল আওয়ামি লিগের অঙ্গ সংগঠন আওয়ামি ওলামা লিগও।

পাঠ্যবইয়ে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে তা সম্পাদক, রচয়িতা ও সংকলকদের না জানিয়েই করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ধারণা করা হচ্ছে, পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন এনে শেখ হাসিনা মৌলবাদীদের আস্থা অর্জন করলেন। তবে মৌলবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া শেখ হাসিনার নতুন নয়। কয়েক বছর আগে খেলাফত মজলিশের সঙ্গে চুক্তি করেছিল আওয়ামি লিগ। পরে সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির প্রচণ্ড ক্ষোভের মুখে এই চুক্তি বাতিল করতে হয়। দু'বছর আগে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রাক্তন সেনাপতি ও রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের 'রাষ্ট্রধর্ম' ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। বর্তমান সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি ধর্ম ইসলামও রয়েছে। এরশাদ নিজেও ভাবতে পারেননি তাঁর পদক্ষেপ আওয়ামি লিগ লুফে নেবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা মনে করেন, রাষ্ট্রধর্মের মাধ্যমে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। দেশের বিশিষ্টজনেরা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ভয়ঙ্করভাবে থাবা বিস্তার করছে, সরকার একদিকে জঙ্গিবাদ নির্মূলে জিরো টলারেন্সের কথা বলছে, অন্যদিকে মৌলবাদের সঙ্গে আপোশরফা করছে। এ বছরের পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িক অপরাজনীতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্র গবেষক আহমেদ রফিক, সাংবাদিক কামাল লোহানি, লেখক যতীন সরকার, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কবি ও শিক্ষাবিদ্ হায়াৎ মাহমুদ, কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক, সংস্কৃতিজন সৈয়দ হাসান ইমাম, বিজ্ঞানী অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা, অধ্যাপক ড. সফিউদ্দিন আহমেদ, সংস্কৃতিজন রামেন্দু মজুমদার, সংস্কৃতিজন মামুনুর রসিদ, লেখিকা রাবেয়া খাতুন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব, সাংবাদিক আবুল মোমেন, সংস্কৃতিজন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, চলচ্চিত্রকার মসিউদ্দিন শাকুর, প্রকৃতিবিদ দ্বিজেন শর্মা, সংস্কৃতজন মঃ হামিদ-সহ ৮৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিবৃতিতে সই করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মৌলবাদের কাছে সরকার কতোটা পরাজিত, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ পাঠ্যপুস্তক থেকে শিশুদের সৃজন ও মনন বিকাশের উপযোগী রচনা বাদ দেওয়া। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাদ কিংবা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে লালন শাহ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এস ওয়াজেদ আলি, হুমায়ুন আজাদ, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্তর লেখা। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নৈতিক বোধের স্ফুরণ না ঘটিয়ে সেখানে তৈরি করা হচ্ছে বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা। সরকার নিজেকে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতাবিরোধী বলে ঘোষণা এবং এর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দীক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চাকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বললেও পাঠ্যপুস্তকে পশ্চাদপসারণ করেছে। হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক ও সৌহার্দ্যের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়েছে সরকার।

বিশিষ্টজনেরা উদ্বিগ্ন। হেফাজত, আওয়ামি ওলামা লিগ, চর মোনাইর পির, ইসলামি ঐক্যফ্রন্টসহ ইসলামি সংগঠনগুলো চার দশক ধরেই দাবি করছে, হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা জাতীয় সঙ্গীত মুসলিম প্রধান দেশে চলতে পারে না। দেশের সিংহভাগ মাদ্রাসায় বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের পর এবার কি সরকার হেফাজতিদের দাবি মেনে জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের দিকে এগোবে? পতাকা? সেও তো মুক্তিযুদ্ধের। বি.এন.পি-জামায়াত যা করছিল, সেই কাজ যদি আওয়ামি লিগ করে তাহলে আর মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে কী লাভ?

> **“বাংলাদেশের বেশকিছু ইসলামি সংগঠন চার দশক ধরেই দাবি করছে, হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা জাতীয় সঙ্গীত মুসলিম প্রধান দেশে চলতে পারে না। দেশের সিংহভাগ মাদ্রাসায় বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের পর এবার কি সরকার হেফাজতিদের দাবি মেনে জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের দিকে এগোবে?”**

ভারতের তুষারমানব
চেওয়াং নরফেল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ লাদাখের প্রসঙ্গ উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে চোখ জুড়নো প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা। বরফে ঢাকা হিমালয়, নীল আকাশ, মাইলের পর মাইল পাইন আর দেবদারু বন! কিন্তু প্রায়শই এই সৌন্দর্যের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় লাদাখের নিদারুণ জলকষ্টের কথা। বিশেষ করে লাদাখের কৃষকেরা জানেন প্রায় বৃষ্টিহীন মরুভূমির মতো এই অঞ্চলে কৃষিজমিতে জলসেচের জন্য প্রয়োজনীয় জলও মেলে না।

অন্তত চেওয়াং নরফেল নামের এক অকুতোভয় ইঞ্জিনিয়ার অসাধ্যসাধন করার আগে পর্যন্ত মিলত না। নরফেলের বয়েস প্রায় ৭৯ বছর। এই ভদ্রলোককে ঠিকমতো বুঝতে হলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে সেই ১৯৬৬ সালে। তখন নরফেল ছিলেন লাদাখের ঝানস্করের মহকুমা শাসক। তাঁর কাজ ছিল স্কুল বিল্ডিং, ব্রিজ আর রাস্তা বানানো। লাদাখ এমন একটা জায়গা যেখানে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া কঠিন। তাই সেখানে যে-কোনো নির্মাণের কাজই বেশ ঝকমারির ব্যাপার। শ্রমিক না পেয়ে নরফেল একসময় নিজেই রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করলেন। সাহায্য করার জন্য স্থানীয় কিছু গ্রামবাসীকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলেন। এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর নরফেল সেই গ্রামে গিয়ে দেখেছিলেন তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া গ্রামবাসীরা সবাই পুরোদস্তুর রাজমিস্ত্রি হয়ে গেছে। গৃহনির্মাণই তখন তাদের জীবিকা।

এখনও ঘটনাটির কথা মনে পড়লে চেওয়াং নরফেল তৃপ্তি পান। বলেন, 'আমার সামান্য একটু সাহায্য কয়েকজন মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে দেখে সেদিন খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম।'

কিন্তু সেটা ছিল নরফেলের অসাধ্য সাধনের সূত্রপাত মাত্র। বর্তমানে তিনি ভারতের তুষারমানব নামে পরিচিত। লাদাখে তিনি ১০টি কৃত্রিম হিমবাহ তৈরি করেছেন। যার জন্য কৃষিজমিতে জলসেচের সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। নরফেল বলেন, 'লাদাখের প্রায় সব গ্রামে আমার তৈরি রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ, বাড়ি আর সেচব্যবস্থা রয়েছে।' কথাটা নির্জলা সত্যি। তবে রাস্তা বা কালভার্ট নয়। লাদাখের মানুষের হৃদয়ে তিনি স্থান পেয়েছেন তীব্র জলসঙ্কটের সমাধান করার জন্য।

লাদাখ স্পষ্টতই একটি পাহাড়ি মরুভূমি। এখানে বছরে গড়ে বৃষ্টি হয় মাত্র ৫০ মিমি। অথচ এখানকার ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী। সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জলের প্রধানতম উৎস গলে যাওয়া বরফ এবং হিমবাহ। কিন্তু উষ্ণায়নের কারণে প্রাকৃতিক হিমবাহগুলি খুব তাড়াতাড়ি সরে যায়। ফলে চাষিরা জল পায় না। এছাড়া শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্যেও প্রচুর জল নষ্ট হয়ে যায়। নরফেল বলেন, 'আমার মনে হয়েছিল আমরা যদি বরফে পরিণত হওয়া জল সঞ্চয় করতে পারি তাহলে কৃষকদের কিছুটা সুবিধা হবে। তাই আমরা গ্রামগুলির কাছাকাছি কৃত্রিম হিমবাহ তৈরি করা শুরু করেছিলাম।'

নরফেল লক্ষ্য করেছিলেন গ্রীষ্মে বরফ গলে যায় এবং বরফগলা জল সরাসরি নদীতে গিয়ে পড়ে। চাষির কোনো কাজেই লাগে না। নরফেলের মনে হলো এই জল যদি কৃত্রিম হিমবাহ তৈরি করে তাতে ধরে রাখা যায় তাহলে শীতকালে চাষের কাজে লাগতে পারে। ভাবনার প্রথম রূপায়ণ তিনি করলেন ফুটসে গ্রামে। খাল কেটে নদীর জল এনে তিনি অববাহিকা অঞ্চলে প্রথম সেচের ব্যবস্থা করলেন। কয়েকটি বিশেষ অঞ্চল বেছে নেওয়া হলো জলকে বরফে পরিণত করার জন্য।

জীবনের প্রথম হিমবাহটি তৈরি করতে নরফেলের ৯০ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। সাধারণত একটি হিমবাহ ৫০ থেকে ২০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। চওড়ায় ২ থেকে ৭ ফুট। নরফেলের ঐকান্তিক প্রয়াসে লাদাখে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে। উপকৃত হয়েছেন কৃষকেরা। সব থেকে বড়ো কথা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে থাকার ঘটনাও এখন কম। সহজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে চেওয়াং নরফেল লাদাখের গ্রামে গ্রামে জল পৌঁছে দিয়েছেন। বলা ভালো লাদাখকে রক্তমাংসের জীবনের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন।

অহেতুক কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে গিয়ে আখেরে রাজ্যের উন্নতি ব্যাহত করছেন মমতা

জয়দীপ রায়

আশঙ্কা ছিলই, এমনই কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কারণ, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারির পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্নে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, নোটবন্দির বিরোধিতা করায় মোদীবাবু প্রতিহিংসার রাজনীতি করে সিবিআইকে ব্যবহার করেছেন। তার বলি নাকি সুদীপকে গ্রেপ্তার হয়ে দিতে হয়েছে। এরপরই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাঁর হুঙ্কার, 'মনে রাখবেন, মোদীবাবু যদি আইনের ক্ষমতা দেখায়, আমার হাতেও ক্ষমতা আছে। আমিও অনেক কিছু পারি।' তারপর যে কথাটি তিনি উহ্য রেখেছিলেন, সেটি প্রকাশ করে দিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের গ্রেপ্তারের মধ্যে দিয়ে। বিজেপির রাজ্য নেতারা অবশ্য বিষয়টি নিয়ে আইন-আদালতের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। জয়প্রকাশবাবুর বক্তব্য, 'প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাকে চক্রান্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে'। রাজ্য বিজেপির এক নেতার কথায়, মমতা জানেন, তাঁর দলের কোন নেতা-মন্ত্রী সিবিআইয়ের স্ক্যানারে আছে। কাদের হাতে হাতকড়া পরতে চলেছে। কিন্তু আমরা জানি না মমতার মিথ্যা আরোপের খাঁড়া এবার কার ঘাড়ে এসে পড়বে। তাঁর বক্তব্য, আইনের মারপ্যাঁচে প্রতিহিংসা মেটাতে গিয়ে দু-দু'বার আদালতে মুখ পুড়েছে মমতা সরকারের। তাই এবার ও পথে না হেঁটে সরাসরি প্রতিহিংসার রাজনীতির আশ্রয় নেওয়াটাকে মমতা সরকার শ্রেয় বলে মনে করছেন। তা না হলে, খড়্গাপুরের মাফিয়া-ডন শ্রীনু নাইডু খুনে অযাচিত ভাবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নাম জড়ানো হতো না। ধৃতদের একজন মিডিয়ার সামনে পরিষ্কার জানিয়েছেন এ ঘটনার সঙ্গে দিলীপবাবুর কোনও সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক মহলের কাছে এটা পরিষ্কার, মমতা সরকার এবার ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। দিলীপ ঘোষ অবশ্য বলেছেন, তিনি ঘটনার আগে দলীয় কাজে রাজ্যের বাইরে ছিলেন। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে এ ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার আগের মুহূর্ত আঁচ করতে পেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্র তথা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অল-আউট খেলতে শুরু করেছেন। আর মোদীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে গিয়ে টার্গেট হিসাবে বেছে নিয়েছেন রাজ্য বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবারকে। সেই কারণেই আসানসোলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র সাংসদ মেলার নিষেধাজ্ঞা অথবা অন্যায় ভাবে ব্রিগেডে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সভার অনুমতি না দেওয়া এ সবই প্রতিহিংসার রাজনীতির নামান্তর ছাড়া কিছু না। যদিও এই দু'টি ক্ষেত্রেই আদালতে মুখ পুড়েছে রাজ্য সরকারের। এমনকী আইন মাফিক সঙ্ঘের কর্মসূচির অনুমতি না দেওয়ায় আদালতে ভর্ৎসিত হতে হয়েছে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে। কর্তব্যের গাফিলতির জন্য ক্ষুব্ধ আদালত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রজু করেছে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে। রাজ্যে ঝটিকা সফরে এসে মমতার নাম না করে সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবতের সাবধানী কটাক্ষ, 'বিরোধীতার মধ্যে কাজে সাফল্য পাওয়ার আনন্দই আলাদা'। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলেও মমতা যে আইন-কানুনকে তোয়াক্কা করেন না তা বিরোধী নেতাদের কাছে সুবিদিত। সবটা নিজের মতো করে ভাবতে ভালোবাসেন। বিরোধী দলনেতা আবদুল মান্নানের উক্তি, উনি (মুখ্যমন্ত্রী) বুঝতে পারছেন অচিরেই ওঁরও ডাক আসতে চলেছে। এ ব্যাপারে মান্নান সাহেব ওঁর নিকট আত্মীয়দের আর্থিক বার-বাড়ন্তের পাশাপাশি দুই চিটফান্ড কর্তা সুদীপ্ত সেন-গৌতম কুণ্ডুর সঙ্গে ডেলোর বাংলোয় মমতার মিটিং-এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। রাজনৈতিক মহলে চর্চা, যে ভাবে সিবিআই সারদা ও রোজভ্যালি কাণ্ডে একের পর এক তৃণমূল সাংসদদের ধরপাকড় শুরু করেছে তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মমতা। তার ওপর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে নারদ কাণ্ডে আদালতের নির্দেশ। ইতিমধ্যেই ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে তৃণমূলের আরও এক রাজ্যসভার এমপি কেডি সিংহের চিটফাণ্ড সংস্থা অ্যালকেমিস্টের বিরুদ্ধে। কারণ এই সংস্থাটিও বছর দু'ই ধরে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের

ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়লেও কোনো অজ্ঞাত কারণে সেগুলো নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিমের দায়ের করা অ্যালকেমিস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখন মমতার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোজভ্যালি, সারদা-নারদার পর অ্যালকেমিস্ট যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সেটা দিদি এখনই আঁচ করতে পেরেছেন। এই সাঁড়াশি চাপে তৃণমূলের অন্দরে এখন কী হয় কী হয় পরিস্থিতি! এই অবস্থায় ধূর্ত নেত্রী একটি বিষয় বুঝে গিয়েছেন তার দলের কোনো কোনো নেতা-মন্ত্রী সারদা-রোজভ্যালি সংস্থার থেকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। ফলে দিশাহীন হয়ে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল দলনেত্রী। এই সব কেলেঙ্কারি চাপা দিতে তাঁর নির্দেশে সাংসদ-বিধায়ক থেকে পাড়ার কেষ্ট-বিষ্টু নেতারা এখন রাস্তায় নেমেছে প্রতিহিংসার ধোঁয়া তুলে সুদীপ গ্রেপ্তারের বিরোধিতায় রাজ্য অচল করতে। বাংলার মানুষের দুর্ভোগের অভিযোগ তুলে যে মমতা বন্‌ধের কট্টর বিরোধী ছিলেন এবং যার জন্য রাজ্যের মানুষ তাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলার মসনদে বসিয়েছে, সেই মমতার জঙ্গি আন্দোলনের জেরে গোটা রাজ্যের জনজীবন স্তব্ধ। প্রতিদিনই জেলা-শহর জুড়ে তৃণমূলের আন্দোলনের ঝাঁঝে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের। বাসে-ট্রামে নিত্য যাত্রী অথবা পাড়ার চায়ের দোকানে রাজ্য রাজনীতির চর্চায় একটাই বক্তব্য উঠে আসছে, মমতার এই আন্দোলন আদতে সাধারণ মানুষের ‘আই ওয়াশ’ ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। আসল উদ্দেশ্য চিটফান্ডের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যাওয়া দলের কিছু নেতা মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার হওয়া থেকে মুক্ত করা। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন তার দলের কোন নেতা-মন্ত্রী সারদা, রোজভ্যালি থেকে আর্থিক সুযোগ সুবিধা পেয়েছে এবং কারা হাতকড়া পরতে চলেছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকতে চলেছে জেনে এখন তিনি কেন্দ্র তথা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত অল-আউট জেহাদ ঘোষণা করে দিয়েছেন। তিনি ভাল করে জানেন, আইনি পথে গেলে তিনি কোনো সুবিধে করতে পারবেন না। তাই সেই রাস্তায় না হেঁটে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংঘাতের পথকেই বেছে নিয়েছেন। আর তাঁর এই জেহাদ রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে দিতে তার দলের এমএলএ-এমপিদের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও মমতার এই হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের অন্দরেই মতভেদ রয়েছে।

দিদির চক্ষুশূল হবার ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলছে না। তৃণমূলেরই একাংশ মনে করেন, এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে রাজনৈতিক আপোশে সমস্যার সমাধান সূত্র বের করা উচিত। কারণ হিসাবে তাদের যুক্তি, যে উন্নয়নের বার্তাকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট যুদ্ধের বৈতরণী পার করেছেন, সেই উন্নয়নের ৭০ শতাংশ অনুদান আসে কেন্দ্র থেকে। তাই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে সমন্বয় না থাকলে কোনো রাজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে যদি কেন্দ্র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অনুদান দিতে টালবাহানা করে তাহলে আখেরে ক্ষতি রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর। ■

SHYAM TEXTILES LTD.

156A, MAHATMA GANDHI ROAD

KOLKATA - 700 007

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী
মরমি সঙ্গীতশিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তী

বিকাশ ভট্টাচার্য

গানটি যখন প্রকাশ পায় তখন আমি নিতান্তই বালক। তবু ওই একটি গান আমার মতো অজস্র সঙ্গীতানুরাগীর হৃদয়কে মথিত করেছিল। ১৯৫১-তে প্রকাশিত সেই গান আজও গানপাগল বাঙালির কানে বাজে। গানটি— 'মধুর আমার মায়ের হাসি/চাঁদের মুখে ঝরে/ মাকে মনে পড়ে/আমার মাকে মনে পড়ে...'। গীতিকার প্রণব রায়। নিজের সুরে গানটি গেয়েছিলেন সুধীরলাল চক্রবর্তী। ১৯৫১ সালের পুজোয় রেকর্ডটি বাজারে বেরোল। উল্টোপিঠে ছিল 'ও তোর জীবন বীণা আপনি বাজে/ দুঃখ সুখের দুই তারে...'। এ গানটির কথা সুর গাওয়া সবই শিল্পীর। শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তীর এটা জন্মশতবর্ষ। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার একটি গ্রাম বালিয়াডাঙ্গায় ১৯১৬ সালে শিল্পীর জন্ম। বাবা গঙ্গাধর চক্রবর্তী কালেক্টর অফিসে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীতানুরাগী। বাড়িতে বসত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর। সেই আসরে এসেছেন সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী। সুযোগ পেয়ে সেখানে গান গাইলেন সুধীরলাল। কোনো তালিম নেই। শুনে শেখা গান। গিরিজাশঙ্কর তাতেই মুগ্ধ। প্রতিভা চিনতে ভুল করেননি। সুধীরলালকে বললেন, কলকাতায় এসে তাঁর কাছে সঠিকভাবে তালিম নিতে। বাবার কোনো আপত্তি ছিল না। সুধীরলাল কলকাতার গড়পারে তাঁর মামার বাড়িতে চলে এলেন। শুরু হলো সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্করের কাছে গান শেখা। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরির ভাণ্ডার ভরে উঠতে লাগল।

সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে যখন একশো ভাগ পরিণত, তখন জনসমক্ষে এলেন শিল্পী। প্রথমে বেতারে এবং পরে অর্থাৎ ১৯৩৯-এ তাঁর প্রথম রেকর্ড, 'ভালোবেসেছিনু আলেয়ারে' এবং 'রজনী গো যেও না চলে'। কথা দেবেশ বাগচির কিন্তু সুর স্বয়ং শিল্পীর। আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা শিল্পীকে কাছে টেনে নিলেন। দীর্ঘদিন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেওয়া শিল্পীর গানে লাগল না শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উচ্চকিত ছোঁয়া। বিশেষ করে 'রজনী গো' গানটির রোমান্টিক আবেদন শ্রোতাদের মনকে টানলো। শিল্পী বেশিরভাগ গানই নিজের সুরে গেয়েছেন। সুরকাররূপে তিনি তখন যথেষ্ট জনপ্রিয়। তবু নিজের গানে বৈচিত্র্য আনতে তিনি অন্য সুরকারের সুরেও রেকর্ড করেছেন। যেমন, দুর্গা সেন, রবিন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সুধীরলালের প্রত্যেকটি গানের মধ্যে ধরা পড়েছে ভাববৈশিষ্ট্য। খেয়াল-ঠুংরির তালিমপ্রাপ্ত দক্ষ শিল্পী হিসেবে তাঁর সুর ও গায়েকিতে এসেছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রভাবিত অলঙ্কার। ছোট ছোট মুড়কির কাজ। কিন্তু পরিবেশনে প্রাধান্য পেয়েছে ভাব। 'এ জীবনে মোর যত কিছু ব্যথা...', 'খেলাঘর মোর ভেসে গেছে...', 'কেন ডাকো পিয়া পিয়া...' 'গান গেয়ে মোর দিন কেটে যায়...', 'ও তোর জীবন বীণা আপনি বাজে...' এই রকম অজস্র গানে সুধীরলালের সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। তাই তিনি হয়ে উঠেছেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আধুনিক বাংলাগানের একজন দক্ষ রূপকার।

কণ্ঠশিল্পী ও সুরকার-এর মতোই শিল্পী ছিলেন একজন অসাধারণ

সঙ্গীত শিক্ষক। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঢাকা বেতারকেন্দ্রের মিউজিক্যাল প্রোডিউসার। সেখানে গায়ক-গায়িকাদের ট্রেনিং দেওয়া ছিল তাঁর প্রধান কাজ। ব্যক্তিগতভাবে, সারাজীবন সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে গেছেন সফলভাবে। বাংলাগানের জগতে তিনি ছাত্রছাত্রী হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভাবে যাঁদের উপহার দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন উৎপলা সেন, শ্যামল মিত্র, অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, নীতা সেন, অপরেশ লাহিড়ি, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু দিকপাল শিল্পী। শ্যামল মিত্র শিল্পীর মৃত্যুর পর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, '...ভালভাবে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করি সুধীরলাল চক্রবর্তীর কাছে। সুধীরদা আজ নেই, কিন্তু আজ আমার যেটুকু সাফল্য আপনারা দেখছেন, এর মূলে ছিলেন সুধীরদা। আমাকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় আমি রেকর্ডে ও ফিল্মে গান করি...।' শ্যামল মিত্র গুরুর কাছে শিখেছিলেন বহু গান। তার মধ্যে 'স্মৃতি তুমি বেদনা...' গানটি একটু অন্য ধরনের। ২০ এপ্রিল, ১৯৫২-য় শিল্পীর প্রয়াণের বছরেই পুজোয় রেকর্ড করলেন পবিত্র মিত্রের লেখা সেই গান। শ্যামল মিত্রের স্মৃতি যেন উথাল পাথাল করে উঠেছে গোটা গানটিতে।

সবশেষে আসি 'মধুর আমার' গানটির কথায়। কোনো একটি ছায়াছবির প্রযোজনে প্রণব রায় গানটি লিখেছিলেন। ওই ছায়াছবির সুরকার ছিলেন সুধীরলাল। প্রোডিউসার গানটি শুনে পছন্দ করলেন না। ছবি থেকে গীতিকার ও সুরকার দু'জনেই সরে এলেন। পরে ঠিক হলো রেকর্ডে নন-ফিল্ম সং হিসেবে গানটি প্রকাশ পাবে। সুধীরলালের ইচ্ছে ছিল ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে দিয়ে গানটি রেকর্ড করাবেন। সব শুনে ধনঞ্জয় বললেন, আমি নয়। এ গান রেকর্ড করবেন আপনি। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। বাকিটা ইতিহাস। তবে সুধীরলালের অকাল প্রয়াণের (১৯৫১) পর থেকে শিল্পীর স্মরণে যত অনুষ্ঠান হয়েছে সেইসব অনুষ্ঠানে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য 'মধুর আমার' ও 'খেলাঘর মোর ভেসে গেছে' গান দুটি গেয়ে শিল্পীর উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রদ্ধা জানাতেন।

***তথ্যঋণ :** সুরনির্ঝর— অভীক চট্টোপাধ্যায়*

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ২১

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০্ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

শব্দরূপ-৮২০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

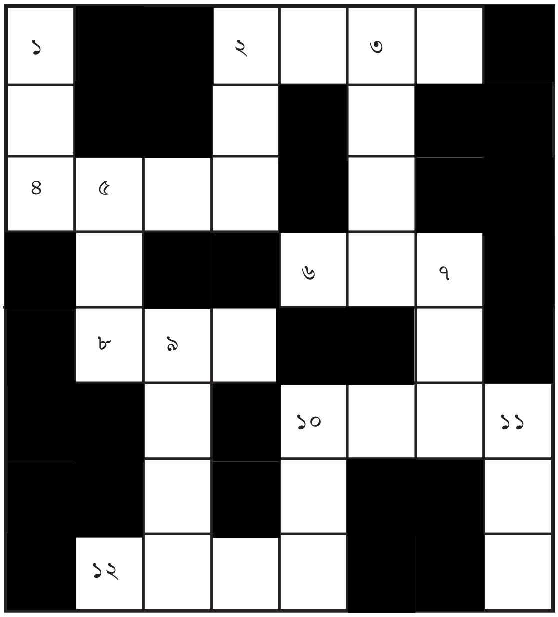

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. সমুদ্র; বাল্মীকি-র পূর্বনাম, ৪. পূজ্য ব্যক্তির চরণপৃষ্ঠ জল, ৬. পবননন্দন হনুমান, ৮. সামন্ত রাজা, ১০. পণ্ডিত, পারদর্শী, ১২. উত্তররামচরিত রচয়িতা বিখ্যাত সংস্কৃত কবি।

উপর-নীচ : ১. জমির সীমানির্দেশক ছোট থাম, ২. এ যুগে এরাই ভক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে, ৩. অভীষ্ট ফলপ্রদ স্বর্গবৃক্ষ, ৫. দুই তারের বাদ্যযন্ত্র, ৭. নতুন দিল্লি-র সন্নিকটে ভারতের বৃহত্তম কারাগার, ৯. ‘গীতগোবিন্দ’-র কবি, ১০. অষ্টপ্রকার যোগলব্ধ ঐশ্বর্য; ভস্ম, ১১. এই মুনির হাড়ে বজ্র নির্মিত হয়েছিল।

সমাধান
শব্দরূপ-৮১৭
সঠিক উত্তরদাতা
দীপক রঞ্জন দাস
জোড়াঘাট লেন,
চুঁচুড়া, হুগলী
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম

		অ	শ্ব	ত্থ	মা		মা
খে	চ	র			ক		দ
	তু				না	কা	ল
জ	রা	স	ন্ধ			ল	
	ন			ক	র	পু	ট
মি	ন	তি				রু	
কা		তা			উ	ষ	সী
ডো		স	ত্য	ভা	মা		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

- ৮২০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু’দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর ‘চিঠিপত্র’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। ‘চিঠিপত্র’ **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর ‘শব্দরূপ’ লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু’টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে করার ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ গোয়া ও মণিপুরে বিধানসভা নির্বাচন হয়ে যাবার পর ল কমিশন এবং নির্বাচন কমিশন লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে রাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচন একযোগে করা যায় কিনা খতিয়ে দেখার জন্য পর্যালোচনা শুরু করবে।

সম্প্রতি ল কমিশনের চেয়ারম্যান জাস্টিস বি.এস চৌহান জানিয়েছেন, লোকসভা এবং দেশের অন্তত অর্ধেক বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ যদি রাজি থাকেন তাহলে ২০১৯-এই তা করে দেখা যেতে পারে। তিনি বলেন, 'পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলব। যার মধ্যে অন্যতম হলো ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচন এবং দেশের অন্তত অর্ধেক বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে করানো।' তিনি বলেন, এটা করা সম্ভব। আপাতত ল প্যানেলের সদস্যরা এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করছেন।

বি.এস চৌহান

আইন ও বিচার বিভাগীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখে ২০১৫-র ডিসেম্বরে তাদের রিপোর্ট সংসদে পেশ করেছেন। সেই রিপোর্টে ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে অর্ধেক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বাকি বিধানসভাগুলির নির্বাচন তাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর করা হবে বলেও প্রস্তাব করা হয়েছে।

পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় সরকার একযোগে নির্বাচন প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাস্টিস চৌহান বলেন, স্বাধীনতার পর লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে করারই রীতি ছিল। ১৯৫২, ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালে এই রীতি মেনেই নির্বাচন হয়েছিল। প্রথম ব্যতিক্রম দেখা যায় ১৯৬৮ সালে। তারপর বেশ ককেবার সংশ্লিষ্ট সরকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই লোকসভা ও কয়েকটি বিধানসভা ভেঙে দেওয়ায় নির্বাচনের রীতি পাল্টে যায়। কেন্দ্রের এনডিএ সরকার আবার সেই পুরনো রীতি ফিরিয়ে আনতে চাইছে। কারণ, প্রতি ছ'মাসে ভারতের কোথাও না কোথাও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে খরচ যেমন বাড়ে তেমনি বিঘ্নিত হয় সরকারি কাজকর্ম। নির্বাচনী বাধ্যবাধকতার কারণে সময়োপযোগী অনেক সিদ্ধান্তও নেওয়া যায় না।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য রাজ্যে ১০০ একর জমি চিহ্নিত

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ রাজ্যের মোট আটটি জায়গায় জম্মু ও কাশ্মীর সরকার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ফলে গৃহহারা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের জন্য ১০০ একর জমি চিহ্নিত করেছে। এছাড়া, নথিভুক্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলির অন্তত একজনের সরকারি চাকরি এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মস্থলের কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বাস্তু পরিবারের অন্তত একজনকে চাকরি দেবার কথা তাঁর কাশ্মীরের জন্য বিশেষ প্যাকেজে উল্লেখ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে ১৭০০ যুবক ইতিমধ্যেই চাকরি পেয়েছেন এবং তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে বুদগাম এবং কাজিগান্দ অঞ্চলে। আরও ৪৩০০ যুবককে চাকরি দেবার কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও প্রায় ৩০০০ যুবককে চাকরি দেওয়া হবে। এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে প্রায় ৬২০০০ পরিবার উদ্বাস্তু হিসেবে নাম নথিভুক্ত করিয়েছে। যার মধ্যে ৪০,০০০ পরিবারের বর্তমান ঠিকানা জম্মু, ২০,০০০ পরিবারের দিল্লী এবং ২০০০ পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন সারাদেশে। উদ্বাস্তু যুবকদের চাকরি দেবার সঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ জম্মু ও কাশ্মীরে হচ্ছে। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর এনডিএ সরকার কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের জন্য মোট ৫০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। সেই টাকায় জম্মু ও কাশ্মীর সরকার পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেছে। চিহ্নিত হয়েছে ১০০ একর জমি। এরপর শুরু হবে বাসস্থান নির্মাণের কাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৯০-এর দশকে জঙ্গি আন্দোলন শুরু হবার পর কাশ্মীরি পণ্ডিতদের স্বভূমি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। পুনর্বাসনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা।

সমাবেশ সমাচার

প্রতিবাদমুখর ১১ জানুয়ারি

প্রকৃত বিচারের দাবিতে শ্রদ্ধায়, শপথে, মৌনমিছিলের মুখরতায় পালিত হলো ১১ জানুয়ারি। বিগত ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারি কলকাতা পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত টালা ঝিল পার্কের ভিতর একটি সাজানো ঘটনায় প্রাণ হারান আরতি সেনগুপ্ত। পৌরকর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের নিপুণতায় অপরাধীরা আজও নাগালের বাইরে। লড়াই কিন্তু চলছে— আইনের পথেই হোক কিংবা রাজপথে। অগ্রণী ভূমিকায় আরতিদেবীর পুত্র কিংশুক সেনগুপ্ত। ১১ জানুয়ারি সকালে টালা ঝিল পার্কে প্রতিষ্ঠিত আরতিদেবীর স্মৃতিফলক প্রাঙ্গণ থেকে গৈরিক পতাকায় মোড়া বিশাল মৌন প্রতিবাদ মিছিল যেন সেই লড়াইয়েরই বার্তা ছড়িয়ে দিল।

মল্লারপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যালয় উদ্বোধন

১২ জানুয়ারি ২০১৭ স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৪তম জন্মদিনে উত্তর বীরভূম জেলার মল্লেশ্বর মহকুমার মল্লারপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়। নব নির্মিত ভবনের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করেন অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত্যচরণ দত্ত। এই উপলক্ষে গোটা মল্লারপুর শহর গেরুয়া পতাকায় ভরিয়ে দেওয়া হয়। বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে দ্বারোদ্ঘাটন হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করার পর পূজাপাঠ চলে। চলে প্রসাদ বিতরণ। ১১টায় নির্মলাক্ষ্মীতলা রামকৃষ্ণ আশ্রম মাঠে প্রকাশ্য জনসভা ও স্বয়ংসেবক সম্মেলন হয়। আদিবাসী নৃত্য দিয়ে কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। চারটি আদিবাসী নাচের দল অংশগ্রহণ করে। সভা পরিচালনা করেন কল্যাণ মণ্ডল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত্যচরণ দত্ত। ক্ষেত্রীয় প্রচারক প্রমুখ রমাপদ পাল, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, উত্তর বীরভূম জেলা সঙ্ঘচালক অশোক ঘোষ, জেলা প্রচারক পরিতোষ দে, বীরভূম বিভাগ কার্যবাহ শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল, বিভাগ প্রচারক উত্তম মণ্ডল। বীরভূম জেলা থেকে প্রচারক বের হওয়ার জন্য অনুপ মণ্ডল ও সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরীকে ফুলের তোড়া ও শাল দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সকলের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত খিঁচুড়ি তরকারি ও চাটনি খাওয়ানো হয়। প্রায় তিন হাজার লোক ভোজন করেন।

সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বিবেকানন্দ ট্যাবলো নিয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন ছিল। পুলিশ ও প্রশাসনের বিরোধিতা বাধা ও গ্রেপ্তারের হুমকির জন্য শোভাযাত্রা করা যায়নি। সর্বব্যবস্থা প্রমুখ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বীরভূম বিভাগের সেবা প্রমুখ অমর দে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অদ্বৈত্যবাবু বলেন, মোদীর বিরোধিতা করুন, আর এস এসের বিরোধিতা করুন কিন্তু ভারতের অপমান করবেন না। রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দুদের বিরোধিতা করবেন না। যারা হিন্দুদের বিরোধিতা করছেন তারা আমাদের শত্রু নয়। তারা ভুল করে করছেন, নয়তো রাজনৈতিক চাপে পড়ে করছেন। তাদের কাছে গিয়ে বোঝানো দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে।

ভারতমাতা পূজা

২১ জানুয়ারি হাওড়া বড়গাছিয়া, পাতিহাল, বাকুল, হাটাল অঞ্চলের সঙ্ঘ-অনুরাগীরা বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এই বছরেও ভারতমাতা পূজার আয়োজন করেছিলেন। গত ২১ জানুয়ারি দুপুর ২টোর সময় প্রায় এক হাজার যুবক শোভাযাত্রা করে ভারতমায়ের প্রতিমা নিয়ে আসেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক সনাতন মাহাতো প্রদীপ প্রজ্বলন করে উদ্বোধন করেন ও সন্ধ্যায় নাগরিক সমাবেশে ভারতমাতা ও আমাদের দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া লেফ্টানেন্ট মোহন রাও, সঙ্ঘের হাওড়া জেলার বৌদ্ধিক প্রমুখ শুভেন্দু সরকার ও স্থানীয় কার্যকর্তা কৌশিক মুখার্জী, পলাশ পান, স্বরূপ কুণ্ডু, নিশীথ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তিনদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ ও দুঃস্থ মানুষদের কম্বল দান ও সেবা কাজ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও পরিচালনা করেন সৌমেন্দ্রনাথ (তুতুল) কাঁড়ার।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গাজোল মহকুমার কার্যালয়ের জন্য ভূমিদাতা তথা মন্দিরা জুয়েলার্সের কর্ণধার সুধীর চন্দ্র দাসের পিতৃদেব ক্ষীরমোহন দাস গত ১ মাঘ ১৪২৩ ইংরেজি ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ রবিবার ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৩ কন্যা, পুত্রবধূ, স্ত্রী, নাতি-নাতনি ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

* * *

গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ মেদিনীপুর জেলা কার্যবাহ মৃণালকান্তি খানের পিতৃদেব মদনলাল খান পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতার কাজ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি তিন পুত্রকে রেখে গেছেন। তিন পুত্রই স্বয়ংসেবক।

সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জাতপাত-ভিত্তিক সংরক্ষণ চালু রাখা উচিত কিনা, এই নিয়ে ওঠা সাম্প্রতিক বিতর্কের জবাব দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ দত্তাত্রেও হোসবলে। তিনি জানিয়েছেন সঙ্ঘ কোনোদিনই সংরক্ষণের বিরোধী নয়।

তিনি আরও বলেন যতদিন দেশে জাতপাত-ভিত্তিক এবং জন্মভিত্তিক বৈষম্য থাকবে ততদিন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও থাকবে। রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত লিটারেচার ফেস্টিভালে দত্তাত্রেও হোসাবলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'সঙ্ঘ সংবিধানের সংরক্ষণ-নীতিকে সমর্থন করে এবং যতদিন দেশে জাতপাত-ভিত্তিক বৈষম্য থাকবে, ততদিন করেও যাবে। অনেক আগে থেকেই এটা সঙ্ঘের ঘোষিত অবস্থান।'

উবাচ

"মুসলমান মহিলারা শোষণের শিকার। তাই তাঁদের অধিকার রক্ষার জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা দরকার।"

ইসলামি বিবাহবিচ্ছেদ প্রথা তিন তালাক প্রসঙ্গে।

তসলিমা নাসরিন
নির্বাসিতা বাংলাদেশি লেখিকা

"ভারতের সমাজ এবং মানুষের উন্নয়নের জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের অবদান অনস্বীকার্য। নেতাজি বিষয়ক সব ফাইল এবার ওয়েবসাইটেই পাওয়া যাবে।"

২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন প্রসঙ্গে।

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"বিরোধীদের হেনস্থা করতে পারলে তৃণমূল নেত্রী কর্মীদের পুরস্কৃত করেন। এখন তৃণমূলের সংস্কৃতি এমনই হয়ে উঠেছে।"

মালদহে তৃণমূল কর্মীদের হেনস্থার প্রসঙ্গে।

বাবুল সুপ্রিয়
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

"রামমোহন লোকের কথা না শুনে সতীদাহ বন্ধ করেছিলেন, সেটি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। বিবেকানন্দ নতুন চিন্তার সন্ধান দিয়েছিলেন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান না বলে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভাই বলেছিলেন, ওটাও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক।"

ক্যালকাটা ক্লাব-দ্য টেলিগ্রাফ বিতর্কসভায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক প্রসঙ্গে।

সম্বিত পাত্র
বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র

"মোর্চাকে জব্দ করতে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে বিভাজনের রাজনীতি করছেন। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করছেন।"

মমতা ব্যানার্জির হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে।

বিমল গুরুং
গোর্খামুক্তি মোর্চার নেতা

সাড়ে তিন লক্ষের কণ্ঠে 'জনগণমন'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত এমন এক দেশ যেখানে বহু ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার মানুষ একসঙ্গে বাস করে। কিন্তু ভারতীয়ত্ব এমন এক বন্ধন যা এই বৈচিত্র্যময় মানবসমুদ্রকে একসূত্রে গেঁথে রাখে। সম্প্রতি এমনই এক ভাব-সম্মিলনের সাক্ষী হয়ে রইল গুজরাটের গান্ধীনগর। সেখানে নবনির্মিত খোদাল ধাম মন্দিরে দেবী খোদিয়ারের মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মিলিত হয়েছিলেন প্রায় লক্ষ লক্ষ ভক্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় গলা মেলান সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি মানুষ। এটি একটি রেকর্ড, ইতিমধ্যেই গিনিস বুক অব রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ ঘটনাটিকে নথিভুক্ত করেছেন। এর আগে একজায়গায় একসঙ্গে সব থেকে বেশিসংখ্যক মানুষের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল বাংলাদেশে। ২০১৪ সালে ২,৫৪,৫৩৭ জন বাংলাদেশি নাগরিক জাতীয় সঙ্গীতে গলা মিলিয়েছিলেন। সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়ে ভারত এগিয়ে গেল।

গঙ্গাশোধন প্রকল্পে ২০০০০ যুবক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গঙ্গা তীরবর্তী উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ২৩৩৬টি গ্রামে কেন্দ্রীয় সরকার ২০,০০০ যুবককে 'স্বচ্ছতা দূত' হিসেবে নিয়োগ করবে। এরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গঙ্গাদূষণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নমামি গঙ্গে প্রকল্পের আওতায় এই নিয়োগ হবে। সম্প্রতি ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা প্রাথমিক খরচ বাবদ ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। সরকারের এই পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব পেয়েছে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রক।

নোটবন্দির প্রভাব থেকে মুক্ত কৃষি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারাদেশের মোট ৯টি রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে নোটবন্দির কোনো প্রভাব কৃষিতে পড়বে না। সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছেন ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, নিশান্ত চাড্ডা এবং অরিজিৎ দাস। ৯টি রাজ্যের ৪৮টি জেলায় এই সমীক্ষা করা হয়েছে। রাজ্যগুলি হলো : মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খন্ড এবং মহারাষ্ট্র। সমীক্ষা থেকে জানা গেছে নোটবন্দির পর মোট ৬১৬.২ লক্ষ হেক্টর জমিতে রবিশস্যের চাষ হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৬ শতাংশ বেশি। শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নোটবন্দির তেমন কোনো প্রভাব কৃষিতে পড়েনি।

মণিপুরে বিশেষ জ্বালানিবাহী বিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আটচল্লিশ দিন অতিক্রান্ত পাঁচটি নতুন জেলা গঠনের প্রতিবাদে ইউনাইটেড নানা কাউন্সিলের ডাকা অর্থনৈতিক অবরোধে মণিপুর বিপর্যস্ত। সব থেকে বেশি সমস্যা পেট্রোল ও ডিজেলের। হু হু করে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। নাভিশ্বাস উঠে গেছে সাধারণ মানুষের। পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুমান করে কেন্দ্রীয় সরকার তাই বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে ডিজেলবাহী ৬টি ট্যাঙ্কার পাঠিয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৯৬০০০ লিটার ডিজেল ইম্ফলে পৌঁছেছে। আরও ৩২০০০ লিটার পাঠানো হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর থেকে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল ২ ও ৩৭ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রেখেছে। যার জেরে ইম্ফল থেকে ডিমাপুর এবং ইম্ফল থেকে জিরিবামের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ। মণিপুরের একাধিক নাগরিক গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের বৈঠকের পর কেন্দ্র এই উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে। মণিপুর রাজ্য বিজেপির নেতা ধীরেন সিংহ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৪ জানুয়ারি জাতীয় মহিলা শিশু দিবসে লিঙ্গ-বৈষম্য রোধে ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারের 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহিলা শিশুদের সমানাধিকারের দাবিও তোলেন তিনি। এক টুইটে প্রধানমন্ত্রী বলেন : 'জাতীয় মহিলা শিশু দিবস সেইসব মহিলা শিশুদের সাফল্যকেই উদ্‌যাপন করে, যাঁরা আমাদের গর্বিত করেছেন।'

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
30 January - 2017 - Rs. 10.00, (Republic Day Spl. Issue)

At Sarda, we believe that forests and plywood can co-exist. Our plywood makes products using only half the volume of sawn timber. We are also FSC certified using timber sourced from only sustainable managed forests.

So the next time you sit on a chair made of our plywood, you will feel more comfortable knowing you have made a small contribution towards saving a forest.

The Forest Friendly Company

OUR BRANDS

DURO TITANIUM LASTS FOREVER | DURO NATURE SIGNATURE PREMIUM VENEERS & PLYWOODS | Duroboard INDIA'S NO.1 BLOCK BOARD | DURO TECHPLY PLYWOOD • BLOCKBOARD ENGINEERED TO PERFECTION

DURO Pumaply ALL WEATHER PROOF PLYWOOD | SARDA DUROTEAK TEAK DECORATIVE PLYWOOD | DUROFLEX PREMIUM FLEXIBLE PLYWOOD | DURO TUFFWOOD LVL FRAMES | DURODOOR ELEGANCE HDF MOULDED DOOR

Sarda Plywood Industries Ltd.

Corporate Office:
4th Floor, North Block, 113, Park Street, Kolkata 700016, Phone: (033) 22652274

Toll Free Number
1800-345-3876 (DURO) 10am-6pm/Monday-Friday | E-Mail: corp@sardaplywood.com
www.sardaplywood.in www.facebook.com/duroplyindia

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।